বাংলা গদ্যসাহিত্যে অক্ষয় কুমার দত্ত ও দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর

(BANGLA GADYA SAHITYE AKSHAY KUMAR DUTTA O DEBENDRANATH THAKUR.)

ড. অন্তরা চৌধুরী
সহযোগী অধ্যাপক,
বাংলা বিভাগ, দেশবন্ধু মহাবিদ্যালয়,
দিল্লি বিশ্ববিদ্যালয়

KEYWORDS-

চিন্তাশীল , বৈজ্ঞানিক অনুশীলন, যুক্তিনিষ্ঠ ,ধর্মচেতনা, আধ্যাত্ম অনুভূতি, গদ্যের দোষ ত্রুটি , সংস্কৃত নির্ভরতা মুক্ত করা, উপযোগী গদ্য ভঙ্গির সৃষ্টি করেন।

ABSTRACT-

১৮ শতকের একেবারে শেষের দিকে বাংলায় বেশ কিছু আইনের বই, বিজ্ঞাপন, বিজ্ঞপ্তি, আদালতনামা লেখা হলেও তা সাহিত্য পদবাচ্য নয়। এই গ্রন্থগুলির ভাষা আরবী-ফার্সী শব্দে পরিপূর্ণ। বাংলা গদ্যসাহিত্যের যথার্থ ব্যবহার শুরু হয়েছিল মিশনারীদের হাতে। ইংলন্ড থেকে আগত ইস্ট ইন্ডিয়া কর্মচারীদের বাংলাভাষা শিক্ষা ও কাজকর্ম করবার মাধ্যম হিসেবে বাংলা শেখার প্রয়োজনীয়তা দেখা দিল। এই উদ্দেশ্যে ১৮০০ খ্রীস্টাব্দে কলকাতায় ফোর্ট উইলিয়াম কলেজ স্থাপিত হলো। এই বাংলা শিক্ষা বিভাগের অধ্যক্ষ উইলিয়াম কেরী কলেজের কার্যারম্ভের প্রথম বছরেই 'ব্যাকরণ' ও 'কথোপকথন' প্রকাশ করেন। এছাড়া অন্যান্য লেখক রামরাম বসুর 'রাজা প্রতাপাদিত্য চরিত', গোলকনাথ শর্মার 'হিতোপদেশ', রাজীবলোচন মুখোপাধ্যায়ের 'মহারাজা কৃষ্ণচন্দ্র রায়স্য চরিত্রম্', চণ্ডীচরণ মুনসীর 'তোতা ইতিহাস', মৃত্যুঞ্জয় বিদ্যালঙ্কারের 'বত্রিশ সিংহাসন', 'প্রবোধচন্দ্রিকা' প্রকাশিত হয়। এর পূর্বে বাংলা গদ্য ব্যক্তিগত চিঠিপত্র ও ব্যবসা ঘটিত কাগজপত্রও আদালতের আর্জিতে সীমাবদ্ধ ছিল।

সে ভাষায় কোন বিশুদ্ধি বা সুষমা ছিলনা। এছাড়া ফোর্ট উইলিয়াম কলেজের শিক্ষকদের গদ্যরীতি পাঠ্যপুস্তকেই সীমাবদ্ধ ছিল। পাঠ্যপুস্তকের বাইরে যিনি বাংলা ব্যবহারিক গদ্যের সৃষ্টি করলেন তিনি হলেন রাজা রামমোহন রায়। তিনি তাঁর প্রচারিত একেশ্বরবাদ বা ব্রাহ্মধর্মের সূত্রপাত করেছিলেন বাংলা গদ্যে কয়েকটি উপনিষদের বাংলা অনুবাদ করে। এছাড়া 'বেদান্তগ্রন্থ', 'বেদান্ত চন্দ্রিকা', 'গৌড়ীয় ব্যাকরণ', 'ব্রাহ্মণ সেবধি' নামক পত্রিকা প্রকাশ করেন। রামমোহনের গদ্যরীতি সংস্কৃতধর্মী হলেও তা প্রাঞ্জল ও বিষয়ানুগ।

বাংলা গদ্যের দোষত্রুটি ও সংস্কৃত-নির্ভরতা মুক্ত করে যিনি নির্দিষ্ট পথটি নিরূপণ করেছিলেন তিনি ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর। তাঁকে বাংলা সাধুভাষার গদ্যের জনক বললেও অত্যুক্তি হয় না। পূর্ববর্তী বাংলা গদ্যের শ্রীহীন অবয়বে তিনি মেদ-মাংস-অস্থি-রক্ত সংযোজন করে ও তাতে প্রাণসঞ্চার করে সাধারণের ব্যবহার্য জীবন্ত গদ্যভাষারূপে স্থাপিত করেন। ছন্দ, যতি, রিদম বা তাল যোগে বাক্য গঠন করে সাহিত্যের উপযোগী গদ্যভঙ্গীর সৃষ্টি করেন।

বাংলা গদ্যের সৃষ্টিতে বিদ্যাসাগরের প্রধান সহযোগী ছিলেন অক্ষয়কুমার দত্ত ও দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর। দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর কর্তৃক ১৮৪৩ খ্রীস্টাব্দে 'তত্ত্ববোধিনী পত্রিকা' প্রকাশিত হলে অক্ষয়কুমার দত্ত তার প্রধান সম্পাদক নিযুক্ত হন ও কয়েক বছর ধরে পত্রিকাটি সম্পাদনা করেন। এই পত্রিকায় তাঁর প্রবন্ধগুলি প্রকাশিত হতো। এইসব প্রবন্ধ পরে পুস্তকাকারে প্রকাশিত হয়। তাঁর প্রথম পুস্তক 'ভূগোল' (১৮৪৩), 'বাহ্যবস্তুর সহিত মানব প্রকৃতি সম্বন্ধবিচার, (১৮৫২), 'চারুপাঠ প্রথম, দ্বিতীয় ও তৃতীয়, ভারতবর্ষীয় উপাসক সম্প্রদায় (দ্বিতীয় খন্ড) প্রকাশিত হয়। বৈজ্ঞানিক অনুশীলনে দক্ষ অক্ষয়কুমারের রচনাভঙ্গী বিষয়ানুগ হলেও সাহিত্য গদ্যের অনুবর্তী নয়। তবে আমাদের দেশে বিজ্ঞান-আলোচনার পথিকৃত হিসেবে তাঁর স্থান বিশেষ ভাবে আলোচনার যোগ্য।

দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুরের রচনা অধিকাংশই ধর্মবিষয়ক। দেবেন্দ্রনাথ রামমোহন রায়ের প্রকৃত অনুগামী হলেও ব্রাহ্ম ভাবধারায় অনেকাংশে পৃথক ছিলেন। তাঁর ব্রাহ্মধর্মগ্রন্থ (১৮৪৯), আত্মতত্ত্ববিদ্যা (১৮৫১), ব্রাহ্মসমাজের বক্তৃতা (১৮৬২), জ্ঞান ও ধর্মের উন্নতি (১৮৯৩), আত্মজীবনী (১৮৯৮) প্রভৃতি গ্রন্থ যথেষ্ট সমাদর

লাভ করে। তাঁর আত্মজীবনী একাধারে ঈশ্বর অনুভূতি ও প্রকৃতি প্রেমের সমন্বয়-সাধক এক অনুপম সংযোজন। বাংলা গদ্যের আরম্ভ লগ্নে এই দুজন গদ্যশিল্পী অতিশয় সম্মানের আসন লাভ করেন।

মূল প্রবন্ধ

পৃথিবীর যে কোনও দেশের সাহিত্যে আধুনিকতার উন্মেষ পর্বটি নির্ধারণ করা দুঃসাধ্য বলা চলে, কারণ এর কোনও নির্দিষ্ট সময়, কাল বা দিবস নির্দিষ্টভাবে নির্ণয় করা যায় না। এই উন্মেষ বা প্রারম্ভ পর্বটি কখনও ধীরে ধীরে, আবার কখনও কখনও কোনও অভিঘাতের মাধ্যমে প্রকাশিত হয়, তা রাষ্ট্রনৈতিক, সামাজিক ও ব্যক্তিকেন্দ্রিকও হতে পারে। সকল যুগেই এমন এক একজন ব্যতিক্রমী লেখক বা সাহিত্যিক থাকেন যাঁরা সমসাময়িক কালের প্রচলিত বিশ্বাস বা আদর্শের বিপরীতধর্মী মনোভঙ্গিতে বিশ্বাস করেন। এর ফলে একটি স্পষ্ট বিদ্রোহের সুর ধ্বনিত হয় যা একটি নতুন ভাবধারাকে সাবলীলভাবে অগ্রসর হতে সাহায্য করে।

বাংলা সাহিত্যও তার ব্যতিক্রম নয়। মধ্যযুগের মঙ্গলকাব্য রচয়িতারা দেবমহিমা প্রচারের অন্তরালে মানবজীবনের রসকেও প্রাধান্য দিয়ে এক নতুন বাস্তবতা ও সমাজ সচেতনতার পরিচয় দিয়েছিলেন সত্য, তবে যুগের পরিবর্তনের সঙ্গে সঙ্গে সেই দৃষ্টিভঙ্গিরও প্রভূত পরিবর্তন ঘটে। সমাজ ও জনজীবনের প্রতি অপরিসীম কৌতূহল, মুক্তমনের স্বচ্ছন্দ্যলীলা ও সমাজের বিভিন্ন অসঙ্গতির প্রতি তির্যক দৃষ্টি এবং ব্যঙ্গ পরিহাস-সবই আধুনিক দৃষ্টিভঙ্গির নিদর্শনরূপে গৃহীত হতে পারে। সুতরাং মধ্যযুগের সাহিত্য ধারার মধ্যেই আধুনিকতার বীজ সুপ্ত ছিল একথা বলা যেতে পারে।

কালের পরিবর্তনের সঙ্গে সঙ্গেই বাস্তবতার যে বাতাবরণ রাষ্ট্রজগতের অন্দরে প্রবেশ করেছিল, তা মধ্যযুগীয় ধর্মচেতনাকে পরিবর্তিত করে আধুনিকতার সূক্ষ্মতর চেতনায় উদ্বুদ্ধ করেছিল। অবশ্য এই চেতনা একদিনে সুস্পষ্ট রূপ ধারণ করেনি। ধীরে ধীরে এই পরিবর্তন এসেছে ও পারিপার্শ্বিকের প্রভাবে বাঙালির মনে

নতুন চেতনার উন্মেষ হয়েছে। সিরাজদ্দৌলার বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্রেই তার প্রমাণ মেলে। পলাশীর যুদ্ধ তাই বাংলায় 'নবাবী শাসনের অবসান মাত্র নয়, এর পরিকল্পনা, প্রস্তুতি ও পরিণতিও বহুলাংশে আধুনিক লক্ষণাক্রান্ত। ভারতবর্ষের রাজনীতির ভারকেন্দ্র দিল্লি থেকে মুর্শিদাবাদ ও কলকাতাকেন্দ্রিক হওয়ায় রাজনীতি সম্বন্ধে বাঙালির নৈকট্যজাত নতুন আগ্রহ ও সচেতনতা বৃদ্ধি পেয়েছিল। বাদশাহী ফরমান বা সৈন্যবাহিনীর দাম্ভিক পদযাত্রা কল্পনারাজ্য অতিক্রম করে বাঙালির নিকট বাস্তবতার রাজ্যে মূর্ত হয়ে নিত্যনৈমিত্তিক রূপ ধারণ করলো। এই প্রাত্যহিক বোধগম্যতায় মুর্শিদাবাদের নবাবরাও বাস্তবতার মূর্তিতে প্রতিভাত হল। নবাব আলিবর্দীর মারাঠা দস্যু বা বর্গীর হামলা প্রতিহত করার প্রয়াস বাঙালির স্মৃতিতে অবিচ্ছেদ্য দুঃস্বপ্নের মত অক্ষয় হয়ে আছে।[১] আলিবর্দীর তিন কন্যা ও দৌহিত্রদের পারস্পরিক ঈর্ষা-দ্বেষ ও প্রতিদ্বন্দ্বিতায় উত্তাল পরিবারিক জীবন এবং সিরাজদ্দৌলাকে সিংহাসন চ্যূত করার নক্কারজনক ষড়যন্ত্র বাঙালির সুপরিচিতি কৌতূহল ও বাস্তববোধকে অধিকতর নির্লিপ্ত ও হতবুদ্ধি দর্শক থেকে প্রত্যক্ষ অংশগ্রহণকারীতে পরিবর্তিত হতে বাধ্য করেছে। এই ষড়যন্ত্রের কুশীলবরা মীরজাফর, জগত শেঠ, উমিচাঁদ সকলেই প্রাচীন প্রাসাদ-অলিন্দের রাজনীতি-ধারার অনুগামী হয়েও অনেকটাই আধুনিকধর্মী। পাশ্চাত্য চক্রান্তশীলতার সঙ্গে প্রাচ্যের দৈব সংঘটিত মিলনই এই সংঘাতের মিলনভূমি। পলাশীর যুদ্ধ তাই শুধুমাত্র শাসক পরিবর্তন নয়, বাংলা তথা ভারতবর্ষের নব-অদৃষ্ট রচনা করেছে। এই পরিবর্তনের প্রকৃতি অন্য সমস্ত বিদ্রোহ ও যুদ্ধবিগ্রহ থেকে বস্তুগতভাবেই স্বতন্ত্র ও সচেতনভাবেই তাৎপর্যপূর্ণ।

ভারতবর্ষ তথা বাংলায় ইংরেজ শাসনের সূচনা বিশেষ কয়েকটি কারণে উল্লেখযোগ্য। প্রথমত:, ইংরেজ শাসনের ফলে পাশ্চাত্য বাণিজ্যনীতি ও দ্রব্যবিনিময় প্রথার সঙ্গে বাঙালি ব্যবসায়ী সমাজের পরিচয় ঘটে। এর ফলে ব্যবসা-বাণিজ্যের প্রসার ঘটে, যার প্রভাব সুদূরপ্রসারী। অবশ্য ইংরেজযুগেও বাংলার সঙ্গে বহির্বাণিজ্য উৎকর্ষে ও পরিমাণে নগণ্য ছিল না। তার প্রমাণ হিসেবে মঙ্গলকাব্যের বাণিজ্য যাত্রার বিবরণগুলি যথেষ্ট আকর্ষক ও বিশ্বাসযোগ্যতার চিহ্ন বহন করে। বাংলার মসলিন, সুপারি ও মশলার চাহিদা বৈদেশিক বাণিজ্যে একটি বিস্তৃত ভূমিকা গ্রহণ করেছিল। তবে এই বাণিজ্যের গতি ছিল শ্লথ ও স্বাভাবিক নিয়মেই সীমিত। প্রাকৃতিক বিপর্যয় বা

দুর্ভিক্ষ বা কুশাসনের মতো অতর্কিত বিপদ না হলে বাণিজ্যের কোনও বিশেষ হ্রাস-বৃদ্ধি ঘটতো না। কিন্তু ইউরোপীয় তথা ইংরেজ বাণিজ্যের সঙ্গে ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক স্থাপনের ফলে এই ব্যবসা-বাণিজ্যের মধ্যে একটি অনিশ্চয়তা ও দ্রুত ক্রিয়াশীল প্রভাবের সংযোগে অতীত অভিজ্ঞতা ও বাণিজ্য নীতি হঠাৎ বিপর্যস্ত হয়ে গেল। সূক্ষ্ম শিল্পজাত দ্রব্যের সঙ্গে কারখানা জাত শিল্পের প্রচুর উৎপাদন এক কৃত্রিম নিয়ন্ত্রণজাত বিপর্যয় সৃষ্টি করল । ইংল্যান্ডের শিল্প বিপ্লব উৎপাদনশিল্পে বিশেষ প্রভাব বিস্তার করায় ভারতীয় শিল্পজাত সামগ্রী প্রবল প্রতিযোগিতার সম্মুখীন হল। শিল্পচতুর ব্রিটিশ রাজশক্তি কারখানা বা ফ্যাক্টরি জাত উৎপাদন বিক্রি করে মুনাফা লাভ এর উদ্দেশ্যে দেশীয় শিল্প-বাণিজ্যকে প্রতিযোগিতার সম্মুখীন করল ও সর্ববিধ বিষয় অবলম্বন করে দেশীয় শিল্প-বাণিজ্যকে ধ্বংস করবার চেষ্টা করতে লাগলো। মূলতঃ ইংরেজরা ভারতে উপনিবেশ স্থাপন করে নিজ দেশের অর্থ সম্পদ বৃদ্ধি করবার কাজেই অধিকতর মনোনিবেশ করেছিল। বস্ত্রশিল্পী ও কৃষক সম্প্রদায় এই বিপদের সম্ভাবনায় প্রতিবাদ করলে তাদের ভাগ্যে অত্যাচার নিপীড়ন ব্যতীত কিছুই ছিল না। অন্যদিকে এই শিল্প উৎপাদন বাণিজ্য বিষয়ে কয়েকজন দেশীয় এজেন্ট বা দালাল ব্যবসার গূঢ় বিষয় সন্ধান করে ও দাদন বা অগ্রিম দিয়ে বাণিজ্যে সক্রিয় অংশগ্রহণ করল এবং ইংরেজ বাণিজ্যের কিছু অংশ লাভ করে কলকাতায় অভিজাত ধনী সম্প্রদায়ের প্রতিষ্ঠাতা হল। আবার ইংরেজ শাসনব্যবস্থা প্রবর্তনের ফলে শাসনব্যবস্থা সম্বন্ধে আধুনিক ধ্যানধারণা জনসমাজে আগ্রহ জন্মাতে সাহায্য করেছিল। ইংরেজদের বিচারব্যবস্থা, রাজস্ব নির্ধারণ, চিরস্থায়ী ভূমি সংস্কার, রাজস্ব আদায়ের পদ্ধতি প্রভৃতি সম্বন্ধে সম্পূর্ণ অভিনব পদ্ধতি জনসাধারণের দৃষ্টি আকর্ষণ করল। বাংলার জনসাধারণ মোগল, পাঠান ও নবাবী আমলের শাসনব্যবস্থার তুলনায় ইংরেজ শাসন পদ্ধতিতে অভ্যস্ত হতে আরম্ভ করলো ও বৈষয়িক জীবনে আধুনিক চিন্তাধারার, রীতিনীতির প্রতি আগ্রহ প্রকাশ করতে আরম্ভ করলো। সমাজজীবনে ইংরেজদের সঙ্গে মেলামেশার জন্য ইংরেজি ভাষা ও সাহিত্যকে জানবার আকাঙ্ক্ষা ধীরে ধীরে প্রসারিত হলো। ইংরেজ রাজত্ব প্রতিষ্ঠা ও শিক্ষাদীক্ষা প্রবর্তনের সঙ্গে সঙ্গে বাংলা সাহিত্যেও ব্যাপক পরিবর্তন লক্ষ্য করা গেল। এই পরিবর্তন শুধু বহিরঙ্গে নয়, বরং মানসিকভাবেও সৃষ্টির অনুপ্রেরণা হয়ে দেখা দিল। মূলতঃ

সিভিলিয়ানদের জন্য বাংলা ভাষা শেখার যে আগ্রহ ছিল তা শুধু ইংরেজদের স্বার্থসংশ্লিষ্ট ছিল তা নয়, বাংলা গদ্যসাহিত্যের ক্ষেত্রেও যুগান্তকারী পরিবর্তন দেখা দিল।[২]

প্রাক-আধুনিক পর্যন্ত বাংলা ভাষার ও সাহিত্যের লক্ষণীয় বিষয় এই যে এর মধ্যে গদ্যসাহিত্যের কোন স্থান ছিল না। মঙ্গলকাব্য, গীতিকাব্য, সুরের ভাষা ও ধ্বনির মধ্যেই জীবনের যাবতীয় তথ্য ও তত্ত্ব ব্যক্ত হয়েছিল। বাঙালির স্বাভাবিক কাব্যময়তা ও আবেগপ্রধান মনোভাবই এর জন্য দায়ী। বাংলা সাহিত্যে গদ্যের উদ্ভবই তাই আধুনিকতার অন্যতম প্রধান সূচক বলা চলে। ইউরোপীয় ধর্মযাজকদের দ্বারা খ্রিস্টধর্মের বাণীপ্রচার ও শাসনকার্যের সুবিধার জন্য তরুণ ইংরেজ কর্মচারীদের বাংলা শেখাবার জন্যই ১৮০০ খ্রিস্টাব্দে ফোর্ট উইলিয়াম কলেজের প্রতিষ্ঠা, মুদ্রাযন্ত্রের প্রবর্তন, সাময়িক পত্রিকার উদ্ভব ও বিকাশ, ধর্ম বিষয়ক বাদ-প্রতিবাদ, সমাজমনস্কতা ও মৌলিক মনন শক্তির আবির্ভাবই এই নবজাত গদ্যসাহিত্যকে সমৃদ্ধ করে পরিণত শিল্পসম্মত ও বাস্তববাদী হতে সহায়তা করেছে। এই বিভিন্ন উপাদানগুলি বাংলা গদ্যসাহিত্যের ক্ষেত্রে উৎকর্ষ ও বিচিত্র প্রেরণার আধার হয়েছে। আমাদের আলোচ্য গদ্যরচনার ক্ষেত্রে অক্ষয় কুমার দত্ত ও দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুরের গদ্য সাহিত্য রচনার পরিপ্রেক্ষিতে বাংলা গদ্যের উন্মেষ কালটি যথেষ্ট আলোচনার পরিসর রাখে।

বাংলা গদ্যের লিখিত রূপের লিখিত নিদর্শন পাওয়া যায় প্রধানত 'শূন্যপুরাণ'-এর ভাঙা পদে, প্রাচীন চিঠিপত্র, দলিল দস্তাবেজে, ক্রয় বিক্রয় পত্রে, সহজিয়া পুঁথিতে। একটি উদাহরণ দেওয়া যাক ----

"শ্রী রামগোপাল হালদার সাকীন কলিকাতা মেং হানবর সাহেবের বানিয়া আমা হতে কেসের হিসাব তহবিল হামেসা থাকে কাং জান ডেমার জেং বেড সীতে রসপিঞ্জরি লইলেন মেং জান জপনিয়া হালওয়েল সাহেবের ঠাঁই ১৭৫৫ সালের ১০ দিজম্বর চলন কলিকাতার কমবেস ৪৫০০ চারি হাজার পাঁচ শত্ত তঙ্কা লইয়াছেন সফর বসরা ও পেরসী ইহার মুনাফা ফিসকরা ১৮ আঠারো তঙ্কা দিবেন এক সন এই করার তাহার টাকা পাওয়া যায় নাই এবং খত হারাইয়াছে আর আমী কিছু জানি না ইতি

১৭৫৭ সাল ২০শ সেতম্বর[৩]

এই কর্জপত্রটিতে মেং (Mr.), কাং (Capt), সেতম্বর (September) শব্দগুলি ব্যবহৃত হয়েছে। বোঝা যায়, এই লেখক ইংরেজদের সহিত আদান-প্রদান করতেন, তাই ইংরেজি শব্দের ব্যবহার জানতেন। ছোট ছোট বাক্যে ইংরেজি ভাষার কাঠামো আছে। শতকরা শব্দটির পরিবর্তে 'ফিস করা' অর্থাৎ ফি বা Per শত আর করা যোগ করে। বাক্যের মধ্যে কোন মাত্রা বা দাঁড়ি, কমা নেই। সরল একমুখী বাক্য ব্যবহার করা হয়েছে।

উনিশ শতকে প্রধানত বিদেশি উদ্যোগেই বাংলা গদ্যের ধারাবাহিক চর্চার সূত্রপাত হয়। এর পিছনে বাস্তব প্রয়োজনীয়তা ছিল। একদিকে মিশনারিদের খ্রিস্টধর্ম প্রচারের ক্ষেত্রে এদেশীয় মানুষদের আস্থাভাজন হওয়া, অন্যদিকে ইংরেজ কর্মচারীর ও বণিকদের শাসন ও শোষণ অব্যাহত রাখতে দেশীয় ভাষাগুলিতে ভাব বিনিময় ও কাজ কর্ম চালানো প্রয়োজন হয়ে পড়ে। তাই নিজেদের শিক্ষার প্রয়োজনেই ঊনিশ শতকের সূচনায় অনুবাদ গ্রন্থ ও পাঠ্যবই লেখার উদ্যোগ ঘটে। অবশ্য ফোর্ট উইলিয়াম কলেজের শিক্ষকগণ ও উইলিয়াম কেরির গদ্যরচনার পূর্বেই জোনাথন ডানকান, হেনরি পিটস ফরস্টার, জর্জ ফেডারিক চেরী, নীল এডমনস্টোন, চার্লস বুলার, জন মিলার, কোটনি স্মিথ প্রভৃতি লেখকরা বিভিন্ন আইনের বই, বিজ্ঞপ্তি, বিজ্ঞাপন রচনা করে বাংলা গদ্যের একটি নতুন দিগন্ত উন্মোচন করেছিলেন।[৪]

বাস্তবিক পক্ষে হাজার ১৮০০ খ্রিস্টাব্দে ফোর্ট উইলিয়াম কলেজ স্থাপনের পর থেকে ১৮৩২ খ্রিস্টাব্দ পর্যন্ত শ্রীরামপুরের ব্যাপ্টিস্ট মিশন প্রেস থেকে চীনা ভাষা সহ প্রায় চল্লিশটি গ্রন্থ প্রকাশিত হয়েছিল। ভারতীয় ভাষাগুলির মধ্যে তখন বাংলা নিশ্চয়ই প্রাধান্য লাভ করেছিল, কারণ শ্রীরামপুর, চন্দননগর, চুঁচুড়া প্রভৃতি অঞ্চলে ইংরেজ, ফ্রেঞ্চ, ওলন্দাজ ও পর্তুগিজদের ব্যবসা-বাণিজ্যের প্রধান কেন্দ্র ছিল। এই স্থান থেকেই খ্রিস্টধর্মের ব্যাপক প্রচার ও ঔপনিবেশিক অধিকার ও স্বার্থ বজায় রাখতে বাংলা ভাষা শিক্ষার প্রয়োজনীয়তায় বিশেষ ভূমিকা নিয়েছিলেন বৈদেশিক খ্রিস্টধর্ম প্রচারক দল ও ইংরেজ শাসক কর্তৃপক্ষ। এদেশের মানুষকে শিক্ষা দেওয়ার

সুযোগ দান ইংরেজ স্বার্থেই অনিবার্য হয়ে উঠলো একই সঙ্গে ভারতবর্ষ তথা বাংলাকে জানবার আগ্রহও বৃদ্ধি পেতে লাগলো। তারই কিছু বিলম্বিত ফল হল ঊনিশ শতকে বাঙালি শিক্ষিত মধ্যবিত্ত সমাজের নবজাগরণ। এই শতকের শুরু থেকেই বাংলার রাজনৈতিক, সামাজিক ও অর্থনৈতিক জীবনে নানা ঘাত প্রতিঘাত দেখা যায়। তার ফলে সমাজিক ও সাংস্কৃতিক ক্ষেত্রে তীব্র আলোড়ন ও আন্দোলন গড়ে ওঠে। সমাজ-সংস্কার, ধর্ম-আন্দোলন নীতিপ্রচার, শিক্ষাবিস্তার, ইতিহাস-পুরাতত্ত্ব, প্রাচ্যবিদ্যা, ঐতিহ্য ও সংস্কারে আগ্রহ, বিজ্ঞান ও দর্শন বিষয়ে নতুন দৃষ্টিভঙ্গি এবং বাংলা সাহিত্যের আধুনিক পর্বের সূচনা-এসবই সম্মিলিতভাবে ঘটতে থাকে।[৫]

এসবের ফলে বাংলা গদ্যের বিকাশ খুব দ্রুত ঘটতে পেরেছিল। পরিপার্শ্বিকের প্রভাব ও উপস্থিত প্রয়োজনবোধকে সঙ্গী করে বাংলা গদ্য ধীরে ধীরে সাহিত্যের বাহন হয়ে দেখা দিতে লাগলো। এই সময় কলকাতায় অসংখ্য সভা সমিতি গড়ে ওঠে, সেখানে নানা বিষয়ে প্রবন্ধ পাঠ শুরু হয় এবং তা প্রস্তাব, প্রবন্ধ, বিতর্ক, বক্তৃতা ইত্যাদি নানা আঙ্গিকে আত্মপ্রকাশ করে। এইসব রচনা প্রকাশেরও উদ্যোগ দেখা দেয়; পাঠ্যবই ও অনুবাদের গ্রন্থগুলির বাইরে এটি একটি স্বতন্ত্র ধারা হিসেবে পরিগণিত হয়।

অন্যদিকে বাংলা সাময়িক পত্রেরও ব্যাপক প্রকাশনা শুরু হয়। প্রতিটি পত্রিকাকে কেন্দ্র করে এক একদল গোষ্ঠী গড়ে ওঠে, লেখকদল গদ্য রচনায় উদ্যোগী হন। তাঁদের সমবেত প্রয়াস ও আদর্শ স্বতন্ত্র চিন্তাধারার জন্ম দেয়। সাময়িক পত্রগুলির বিষয়বৈচিত্র্য ও দৃষ্টিভঙ্গি নানাভাবে রূপান্তরিত হতে থাকে এবং এসব পত্রিকার লেখকদের রচনা ধীরে ধীরে ব্যক্তিত্ব-চিহ্নিত গদ্যসাহিত্যের স্পষ্ট অভিমুখটি নির্দিষ্ট করে দেয়। উপন্যাস, জীবনী, ব্যঙ্গ-নকশা, সাময়িক সমস্যা, ধার্মিক আলোচনা ইত্যাদি বিভিন্ন বিষয় অবলম্বন করে বাংলা প্রবন্ধ সাহিত্য একটি মৌলিক রূপ ধারণ করে।

বাংলা গদ্যের প্রারম্ভিক পর্বে ফোর্ট উইলিয়াম কলেজের থেকে প্রকাশিত তিনটি মৌলিক পুস্তিকার উল্লেখ করা যেতে পারে। কলেজের কার্যরাম্ভের প্রথম বছরেই (১৮০১) কেরির কথোপকথন, ব্যাকরণ, রামরাম বসুর রাজা প্রতাপাদিত্য চরিত এবং গোলকনাথ শর্মার হিতোপদেশ প্রকাশিত হয়। রামরাম বসুর ‘লিপিমালা’ (১৮০২), চন্ডীচরণ মুনশির ‘তোতা ইতিহাস’ (১৮০৫), রাজীবলোচন মুখোপাধ্যায়ের ‘মহারাজা কৃষ্ণচন্দ্র রায়স্য চরিত্রম্’ (১৮০৫), এবং মৃত্যুঞ্জয় বিদ্যালঙ্কারের ‘বত্রিশ সিংহাসন’ও উল্লেখযোগ্য। মৃত্যুঞ্জয়-এর অপর বইগুলি হল ‘রাজাবলী’ (১৮০৮), ‘প্রবোধচন্দ্রিকা’ (১৮৩৩)। ‘রাজাবলী’ দেশীয় লেখকের লেখা প্রথম ভারতবর্ষের ইতিহাস।[৬] ‘প্রবোধ চন্দ্রিকা’ বইটি বাংলা ভাষা ও সাহিত্যে অবশ্য পাঠ্যরূপে নির্ধারিত ছিল। ফোর্ট উইলিয়াম কলেজের অন্য পুস্তকগুলিও কলকাতার হিন্দু কলেজ, কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় ও পরে অন্যত্র কলেজে পাঠ্যপুস্তক রূপে নির্ধারিত হয়। ফোর্ট উইলিয়াম কলেজের শিক্ষকরা যে গদারীতির সৃষ্টি করলেন তা পাঠ্যপুস্তকেই সীমাবদ্ধ থাকলো। পাঠ্যপুস্তকের বাইরে যিনি ব্যবহারিক গদ্যের সৃষ্টি করলেন তিনি হলেন রাজা রামমোহন রায়। আমাদের দেশের সর্বপ্রথম আধুনিক চিন্তার অগ্রদূত। রামমোহন সমাজ-সংস্কারের সঙ্গে সঙ্গে তখনকার দিনের রাষ্ট্রনৈতিক সমস্যার দিকেও দৃষ্টিপাত করলেন। তাঁর উদ্যমেই সতীদাহ প্রথা (১৮২৯) নিষিদ্ধ হলো। দিল্লির বাদশাহ বাহাদুর শাহের সমর্থনে ও রাজন্যভাতা বৃদ্ধি করার অধিকার জানাতে তিনি ইংল্যান্ডে গমন করলেন। খ্রিস্টান মিশনারীরা হিন্দু ধর্মের প্রতি তাচ্ছিল্য ও বিদ্রূপ করলে তিনি যোগ্য জবাব দিয়েছিলেন। ভারতবর্ষে তিনিই প্রথম ফারসি ভাষায় ‘মিরাতুল আখবার’ নামে সাময়িক পত্র প্রকাশ করেন। তার এক বছর আগে ইংরেজি বাংলা দ্বিভাষিক পত্রিকা প্রকাশ করেন-তার নাম ‘ব্রাহ্মণ সেবধি’ (১৮২১)।[৭] বাংলা গদ্যকে স্বাধীন বিচরণভূমিতে এনে দেওয়ার কৃতিত্ব রামমোহন রায়ের। সম্ভবত তিনিই প্রথম ব্যক্তি যিনি আধুনিক কালে বাংলা গদ্যের পৃথক ও বৈশিষ্ট্যপূর্ণ চরিত্রটি বুঝতে পেরেছিলেন। তাঁর ‘গৌড়ীয় ব্যাকরণ’ বইটিতে সেই যুগের তুলনায় যথেষ্ট অগ্রসর চিন্তার পরিচয় মিলবে। সংস্কৃত থেকে দুরূহ শাস্ত্রাদি বাংলা ভাষায় অনুবাদ করে দেখিয়েছিলেন যে গুরুতর তত্ত্বকথাও সাধারণ মানুষের বোধগম্য করে তোলা যায়। মৌলিক রচনাতেও রামমোহনের গদ্য অনেকখানি প্রাঞ্জল ও সহজ। তাঁর ভাষায়

বলিষ্ঠতা ও নৈয়ায়িক স্পষ্টতা লক্ষ্য করা যায়। তাঁর ভাষায় পরিহাস রসিকতার পরিচয়ও আছে। তবে সর্বদাই বাকভঙ্গিতে একটা সংযত ও পরিশীলিত ভাব আছে।

সত্যিকারের ভাষা বা গদ্য শিল্পী বলতে যা বোঝায়, তার পরিচয় আমরা পাই ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগরের গদ্য রচনার মধ্যে। বাংলা গদ্যের যাবতীয় ত্রুটি ও অসংগতি পরিহার করে তিনি গদ্যের ভবিষ্যৎ পথটি নির্দিষ্ট করে দিলেন। তাঁর হাতে ভাষার মাত্রাজ্ঞান ও শিল্পসুষমা যুগপৎ পরিস্ফুট হয়ে উঠল। বিরামচিহ্ন যুক্ত হয়ে গদ্যভাষা ধ্বনি ও ছন্দের লালিত্য নিয়ে উপস্থিত হল। বিদ্যাসাগর মূলত: সাহিত্য স্রষ্টার ভূমিকায় না থেকে অধিকাংশ রচনাতেই পাঠ্যপুস্তক প্রণেতা ও অনুবাদক। তিনি ছিলেন একাধারে সমাজ-সংস্কারক ও শিক্ষাবিদ। এই উভয়বিধ দায়িত্ববোধই তাঁর রচনাকে নিয়ন্ত্রণ করেছে। সাহিত্যিকদের মধ্যে যে বিশেষ ধরণের আত্মকেন্দ্রিকতা থাকে তা তাঁর মধ্যে অনুপস্থিত ছিল। ব্যাপক অর্থে মানবতাবোধই তাঁর চরিত্রকে নিয়ন্ত্রণ করেছে। তাঁর অধিকাংশ রচনাই পাঠ্যপুস্তক। সংস্কৃত, হিন্দি বা ইংরেজির অনুবাদ বা অনুসরণ। ‘বর্ণপরিচয়’ বাদ দিলে মৌলিক গদ্য বা প্রবন্ধ ‘সংস্কৃত ভাষা ও সংস্কৃত সাহিত্য শাস্ত্র বিষয়ক প্রস্তাব’ ভারতবর্ষের সাহিত্য ইতিহাস রচনার প্রথম প্রয়াস। সমাজসংস্কারক বিদ্যাসাগরের জীবনব্যাপী উদ্যোগের প্রধান কেন্দ্রবিন্দু শিক্ষা, শিক্ষা-সংস্কার, নারীর সম্মান ও শিক্ষা প্রচেষ্টা। তাঁর সংস্কারমুক্ত ও প্রগতিশীল চেতনা তাঁর গদ্য রচনায় এক অত্যাশ্চর্য পরিচ্ছন্নতা দিয়েছে।

পূর্বেই বলা হয়েছে যে বাংলা গদ্য সাহিত্যের ইতিহাসে সাময়িক পত্রিকাগুলির অবদান অনস্বীকার্য। সাময়িক পত্রগুলির মধ্যে বাংলা গদ্য সাহিত্যের বিবর্তনে সবচেয়ে বড় ভূমিকা পালন করেছিল ‘তত্ত্ববোধিনী পত্রিকা’ (১৮৪৩)। আর তত্ত্ববোধিনীর আগে প্রকাশিত গুরুত্বপূর্ণ পত্রিকা হলো ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্তের ‘সংবাদ প্রভাকর’ (১৮৩১)। ‘তত্ত্ববোধিনী’র লেখক-গোষ্ঠীর মধ্যে সবথেকে উল্লেখযোগ্য অক্ষয়কুমার দত্ত, দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর, রাজনারায়ণ বসু ও দ্বিজেন্দ্র নাথ ঠাকুর। এই পত্রিকাকে কেন্দ্র করে চিন্তাশীল লেখকদের আবির্ভাবের সূত্রপাত ঘটে। এই পত্রিকার সম্পাদক অক্ষয়কুমার দত্ত ও অপর লেখক দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুরই আমাদের আলোচ্য বিষয়।

বাংলা গদ্য সাহিত্যের অন্যতম ব্যক্তিত্ব (১৮২০-১৮৮৬) নবদ্বীপের কাছে বর্ধমান জেলার চুনী গ্রামে জন্মগ্রহণ করেন। তিনি কবি সত্যেন্দ্রনাথ দত্তের পিতামহ ছিলেন। অক্ষয়কুমার বাল্যকালেই কলকাতায় চলে আসেন ও ওরিয়েন্টাল সেমিনারিতে কয়েক বছর পড়াশোনা করেন। বিশেষ কারণে তাঁকে স্কুল ত্যাগ করতে হয়, তবে নিজের চেষ্টায় গৃহে পড়াশোনা করে তিনি গণিত, ভূগোল, পদার্থবিদ্যা, উদ্ভিদবিদ্যা প্রভৃতি বিজ্ঞান বিষয়ে শিক্ষা লাভ করেন। মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ কর্তৃক 'তত্ত্ববোধিনী' (১৮৪৩) প্রকাশিত হলে অক্ষয়কুমার তাঁর প্রথম সম্পাদক নিযুক্ত হন এবং বেশ কয়েক বছর পত্রিকাটি সম্পাদনা করেন। এই পত্রিকায় অক্ষয়কুমারের প্রবন্ধ নিয়মিত প্রকাশিত হতো। এইসব প্রবন্ধ তিনি পরে পুস্তকাকারে সংকলন করেন। প্রথম পুস্তক ভূগোল (১৮৪১) তত্ত্ববোধিনী পাঠশালায় পঠন-পাঠনের জন্য তত্ত্ববোধিনী সভার উদ্যোগে প্রকাশিত হয়েছিল। দীর্ঘকাল পরে দ্বিতীয় পুস্তক 'বাহ্যবস্তুর সহিত মানবপ্রকৃতির সম্বন্ধ বিচার' (১৮৫২) প্রকাশিত হয়। তারপর এই গ্রন্থের ২য় ভাগ, চারুপাঠ (তিনভাগ), ধর্মনীতি, ভারতবর্ষীয় উপাসক সম্প্রদায় (দুইভাগ) ইত্যাদি গ্রন্থ প্রকাশিত হয়। অধিকাংশ গ্রন্থ বা গ্রন্থাংশ প্রথমে তত্ত্ববোধিনী পত্রিকায় প্রকাশিত হয়েছিল।[৮] এই লেখাগুলিতে অক্ষয় কুমারের চিন্তার পরিচ্ছন্নতা ও যুক্তিনিষ্ঠ বৈজ্ঞানিক মনের প্রশংসনীয় পরিচয় পাওয়া যায়।

সমাজ, সাহিত্য, বিজ্ঞান, নীতিবোধ ও ইতিহাস প্রভৃতি একাধিক বিভিন্ন বিষয়ে অক্ষয়কুমারের গদ্য রচনার কাল মোটামুটিভাবে ১৮৪১ থেকে ১৮৮৩ পর্যন্ত প্রসারিত। এই দীর্ঘ চল্লিশ বছরে আটখানি গ্রন্থের প্রকাশকাল যথাক্রমে ভূগোল (১৮৪১), শ্রী ডেভিড হেয়ার সাহেবের নাম স্মরণার্থে তৃতীয় সাম্বাৎসরিক বক্তৃতা (১৮৪৫), বাহ্যবস্তুর সহিত মানব প্রকৃতির সম্বন্ধ বিচার ১ম ভাগ (১৮৫১) ২য় ভাগ (১৮৫৩), বাষ্পীয় রথারোহীদিগের প্রতি উপদেশ (১৮৫৫), ধর্মোন্নতি সাধন (১৮৫৫), ধর্মনীতি (১৮৫৬), পদার্থবিদ্যা (১৮৫৬), ভারতবর্ষীয় উপাসক সম্প্রদায় ১ম ভাগ (১৮৭০), ২য় ভাগ (১৮৫৩)।[৯] তিনি ছিলেন একাধারে তত্ত্ববোধিনী মাসিক পত্রিকার প্রথম বারো বছরের (১৮৪৩-৫৫) সম্পাদক, তত্ত্ববোধিনী পাঠশালার শিক্ষক (১৮৪০) নর্ম্যাল স্কুলের প্রধান শিক্ষক (১৮৫০) এবং

বাংলা গদ্যের অন্যতম প্রধান গদ্যশিল্পী।তাঁর জীবনদৃষ্টি ও গদ্যরীতির মধ্যে একটি অবিচ্ছেদ্য সম্পর্ক ছিল। যুক্তিবাদী অক্ষয়কুমার ঈশ্বর ও ব্রহ্মাণ্ডকে বিজ্ঞান ও যুক্তিনিষ্ঠতার সঙ্গে নির্ধারণ করতে চেয়েছেন। অক্ষয়কুমার ও বিদ্যাসাগর ছিলেন তত্ত্ববোধিনী পত্রিকার সম্পাদকমন্ডলীর সদস্য। বিদ্যাসাগরের সঙ্গে তাঁর অনেক বিষয়েই মতের মিল ছিল। তবে তিনি ছিলেন বিজ্ঞান-সাধক। অক্ষয়কুমারের গদ্য বা প্রবন্ধ সাহিত্যের উল্লেখ করতে গেলে প্রথমেই ভূগোল (১৮৪১)-এর নাম নিতে হয়, এটি অক্ষয়কুমারের প্রথম গদ্যগ্রন্থ। মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথের কোন গ্রন্থ এই সময় প্রকাশিত হয়নি। এমনকি বিদ্যাসাগরের বেতাল পঞ্চবিংশতি আরও ছয় বছর পর ১৮৪৭ এ প্রকাশিত হয়। বাঙালি রচিত বাংলা ভাষায় লিখিত ভূগোল বই সম্ভবত এর পূর্বে প্রকাশিত হয়নি। এই গ্রন্থের ভূমিকায় তিনি লিখেছেন "বহু ক্লেশে ইংরাজী গ্রন্থ হইতে উদ্ধৃত করিয়া বালকদিকের বোধগম্য অথচ সুশিক্ষাযোগ্য এই ভূগোল পুস্তক প্রস্তুত করিয়াছি"।[১০]

'ভূগোল' প্রকাশিত হবার বছর তিনেকের মধ্যে তিনি আর কোন গ্রন্থ প্রকাশ করেননি। এই সময় তিনি 'বিদ্যা দর্শন' (১৮৪২) নামক একটি পত্রিকার সম্পাদনা করেছেন। তাঁর কিছু কিছু রচনা এ পত্রিকার সম্পাদকীয় কলামে প্রকাশিত হয়। স্ত্রীশিক্ষা বিষয়ে অক্ষয়কুমারের নিজস্ব মতবাদ ছিল তিনি তা এই পত্রিকায় দ্বিধাহীন কণ্ঠে ব্যক্ত করেছেন। শুধু তাই নয় স্ত্রীলোক বা মহিলাদের শিক্ষাদান প্রসঙ্গে বিরুদ্ধবাদীদের মতামতকে কঠোরভাবে সমালোচনাও করেছেন।

১৮৪৩ এ তত্ত্ববোধিনী সভার উদ্যোগে 'তত্ত্ববোধিনী' নামে একটি পত্রিকা প্রকাশিত হলো । তিনি সম্প্রদায়গত ধর্মীয় প্রচার থেকে পত্রিকাকে দূরে রেখেছিলেন। তিনি ছিলেন উদারপন্থী ও জ্ঞানমর্গের পথিক। পাণ্ডিত্যের সঙ্গে সঙ্গে তাঁর ভাবনা চিন্তায়ও প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য ভাবধারার একটি আশ্চর্য সমন্বয় ঘটেছিল। তত্ত্ববোধিনীতে মতাদর্শ বা বিষয়বস্তু উভয় দিক থেকেই বৈচিত্র্য দেখা দিয়েছিল। ইতিহাস, শিক্ষা, ধর্ম, বিজ্ঞান সমাজনীতি-সব বিষয়েই মননশীল রচনা প্রকাশিত হতো। অক্ষয়কুমার নিজেই এই পত্রিকার অন্যতম প্রধান লেখক ছিলেন। ১৮৪১ থেকে

১৮৮৩ পর্যন্ত প্রায় বিয়াল্লিশ বছর তাঁর গ্রন্থাকারে প্রকাশিত রচনার সংখ্যা ৯, এর মধ্যে তিনটি একাধিক খন্ডে প্রকাশিত। এখানে একটি কথা বিশেষভাবে বলা দরকার যে অক্ষয়কুমারের একাধিক গ্রন্থ সেই সময়ে পাঠ্যপুস্তক হিসেবে প্রচলিত ছিল। যেমন তিন খন্ডের 'চারুপাঠ' ও 'পদার্থবিদ্যা'| পাঠ্যপুস্তক হিসেবে ব্যবহৃত হলেও এগুলির অন্তর্ভুক্ত প্রতিটি রচনাই অক্ষয়কুমারের নিজস্ব রীতিতে লিখিত, যা মৌলিক প্রবন্ধ বলেই স্বীকৃতি লাভ করেছে।

১৮৪৫ খ্রিস্টাব্দে অক্ষয়কুমারের দ্বিতীয় গ্রন্থ 'ডেভিড হেয়ার সাহেবের বক্তৃতা' প্রকাশিত হয়। বক্তৃতাটি ছোট গ্রন্থ অর্থাৎ পুস্তিকাকারে প্রকাশিত মাত্র আট পৃষ্ঠায় সম্পূর্ণ। বইটির রচনার উৎস ও বিষয় সম্পর্কে 'বেঙ্গল হরকরা' সংবাদ দিয়েছেন "Babu ukhoy coomar Dutta then rose to deliver a discourse, which was in the Bengali language. The subject of it was the changes effected by the agency of education in the Hindu mind"[১১]

অক্ষয়কুমারের তৃতীয় গ্রন্থ 'বাহ্যবস্তু', প্রথম ভাগ (১৮৫১), দ্বিতীয় ভাগ (১৮৫৩) জর্জ কোম্বের 'দি কনস্টিটিউশন অফ্ ম্যান' (১৮২৮) নামক গ্রন্থের অনুসরণে লিখিত বলে ধারণা করা হয়। জর্জ কোম্বে মূলত: স্কটল্যান্ডের নাগরিক ছিলেন। তিনি বিখ্যাত নরকরোটিবিদ(Phrenologist) রূপে পরিচিত ছিলেন। মানুষের খাদ্যাভাসে আমিষ জাতীয় খাদ্য ব্যবহারের অপকারিতা সম্বন্ধে সতর্কতা ও বর্হিজগতের সঙ্গে মানবজীবনের পারস্পরিক ও অঙ্গাঙ্গিভাবে জড়িত প্রকৃত সম্পর্ককে বিশদ বিশ্লেষণই মূলত বইটির প্রধান উপজীব্য। এই গ্রন্থটিকে নিছক অনুবাদমূলক বলে অভিহিত করলেও এটি ইংরেজি গ্রন্থের অবিকল অনুবাদ নয়। গ্রন্থে যে সমস্ত উদাহরণ দেওয়া হয়েছে, তা কেবল ইউরোপীয় অধিবাসীগণের পক্ষেই সুসংগত বা উপকারী নয়, বরং ভারতবর্ষের অধিবাসীদের ক্ষেত্রেও সমানভাবে প্রযোজ্য| একটি উদাহরণ দিলেই তা পরিস্ফুট হবে।-

"পরস্পর বিরুদ্ধে স্বভাব অসমবুদ্ধি ও বিপরীত মতাবলম্বী স্ত্রী পুরুষের পানি গ্রহন হইলে উভয়কেই যাবজ্জীবন বিষম যন্ত্রণা ভোগ করতে হয়। মানবিক ভাব ও বুদ্ধি চালনা কিঞ্চিৎ বই লক্ষ থাকাতে কত কত দম্পতি

মহাঅসুখে কাল যাপন করিয়া থাকেন। যদিও প্রথম উদ্যমে তাহাদের মধ্যে প্রণয় সঞ্চার হইলেও হইতে পারে কিন্তু তাহা অধিককাল স্থায়ী হয় না। পরম সুন্দরী ভার্যার কুসুম সদৃশ মনোহর লাবণ্য ও অবিলম্বে অতি মলিন বোধ হয় এবং পূর্ব যে অপ্রানরূপ অগ্নিকনা মোহরূপ নিবিড় আবরণে আচ্ছন্ন ছিল তাহাও ক্রমে ক্রমে প্রজ্জ্বলিত হইতে থাকে।"

আজকের অসুখী দাম্পত্যজীবন ও বিচ্ছেদের পটভূমিকায় এই বাক্যগুলি কতটা সত্য ও মর্মগ্রাহী, সহমর্মী পাঠক নিশ্চয়ই সহজেই তা হৃদয়ঙ্গম করতে পারবেন।

পরবর্তী গ্রন্থ 'চারুপাঠ' প্রথম ভাগ ১৮৫৩, দ্বিতীয় ভাগ ১৮৫৪ ও তৃতীয় ভাগ ১৮৫৯-অক্ষয় কুমারের রচনায় একটি বিশিষ্ট স্থান অধিকার করে আছে। জ্ঞানের পরিধি যে কতখানি বিষয় রপ্ত করতে পারে 'চারুপাঠ' তার প্রকৃষ্ট উদাহরণ।

নীতি, বিজ্ঞান, সাহিত্য, ইতিহাস প্রভৃতি বিচিত্র ও বৈশিষ্ট্যপূর্ণ বিষয়কে কেন্দ্র করে এই গ্রন্থটি রচিত। এই গ্রন্থটি ঐ শতকের অন্যতম জনপ্রিয় শ্রেষ্ঠ ছাত্র-পাঠ্য হিসেবে স্বীকৃত ছিল। বিষয়গুলিও বিচিত্র ও আকর্ষণীয়। 'চারুপাঠ' প্রথম ভাগে- আগ্নেয়গিরি, সিন্ধুঘোটক, জলপ্রপাত, পৃথিবীর পরিমাপ, বৃক্ষলতাদির উৎপত্তির নিয়ম, আত্মপ্রসাদ, স্বদেশের শ্রীবৃদ্ধিসাধন, পৃথিবীর গতি, তরুণ বয়স্ক ব্যক্তিদিগের প্রতি উপদেশ, মাধ্যাকর্ষণ ইত্যাদি মোট ২৪টি এবং দ্বিতীয় ভাগে হিমশীলা, মুদ্রাযন্ত্র, ব্যোমযান, পিতা-মাতার প্রতি ব্যবহার, অসাধারণ অধ্যাবসায়, প্রবাল কীট, দিগদর্শন, পরিশ্রম, আলেয়া, জন্মভূমি তাপমান, প্রভু ও ভৃত্যের ব্যবহার, সৌরজগৎ ইত্যাদি মোট ২০টি এবং তৃতীয় খন্ডে কীটাণু, মিত্রতা, উল্কাপিণ্ড, স্বপ্নদর্শন, সুশিক্ষিত ও অশিক্ষিত লোকের তারতম্য, বায়ু সেবন ও গৃহ পরিমার্জন, জোয়ার ভাটা, তাড়িত বিদ্যুৎ ও বজ্রাঘাত, সত্যকথন ও সদাচরণ ইত্যাদি মোট ১৩ টি রচনা সংকলিত হয়েছে।

গদ্য প্রবন্ধগুলির প্রতি দৃষ্টিপাত করলেই বোঝা যায় কত বিচিত্র বিষয় নিয়ে এই গদ্যগ্রন্থটি রচিত হয়েছে। ভাষার রূপকল্প ও গভীর মনোহারিতা আদর্শের উচ্চতা চিও বিকাশের পক্ষে জরুরী বলেই এটি দীর্ঘকাল পাঠক মনে ও ছাত্র-ছাত্রীদের কাছে স্থায়ী সম্পদ রূপে পরিণত হয়েছে এবং হবে।

১৮৫৫ তে 'ধর্মোন্নতি সংশোধন বিষয়ক প্রস্তাব' ও 'বাষ্পীয় রথারোহীদিগের প্রতি উপদেশ' নামক গ্রন্থ দুটি প্রকাশিত হয়। প্রথম গ্রন্থটিতে অক্ষয়কুমার নীতি ও ধর্মবোধের বিষয়ে নতুনতর পরিচয় উদ্ঘাটিত করেছেন। ধর্মের চিরাচরিত কুসংস্কারগুলিকে বর্জন করে মানব-কল্যাণকর ধর্মীয় বোধে উজ্জীবিত হতে অনুরোধ করেছেন। ২৬ পৃষ্ঠার এই অতি ক্ষুদ্র গ্রন্থটি শুধু রচনার সাবলীলতায় নয়, মূল বক্তব্য উপস্থাপনার ক্ষেত্রেও নতুনত্বের দাবি রাখে। বলা যেতে পারে, এই গ্রন্থটি অক্ষয়কুমারের 'ভারতবর্ষীয় উপাসক সম্প্রদায়' গ্রন্থের পূর্বসূরী।

'বাষ্পীয় রথারোহী...' (১৮৫৫) বইটিও ছোট। মাত্র কুড়ি পৃষ্ঠার পুস্তক। যারা কলের গাড়ি অর্থাৎ বাষ্পীয় ইঞ্জিন সমন্বিত গাড়িতে আরোহণ করেন তারা যাতে কোনরূপ বিঘ্ন-বিপদের সম্মুখীন না হন সেই বিষয়ে বিভিন্ন উপায়ের উপদেশ দেওয়া হয়েছে। পুস্তিকার শেষে হাওড়া বালিগঞ্জ আপ-ডাউনের গাড়ি যাতায়াতের সময় ও গাড়িভাড়ার উল্লেখযোগ্য একটি তালিকাও লিপিবদ্ধ করেছেন। গাড়িভাড়া কামরার শ্রেণী অনুযায়ী নির্দিষ্ট আছে। যেমন হাওড়া থেকে বর্ধমান প্রথম শ্রেণির ভাড়া ৮ টাকা, দ্বিতীয় শ্রেণীর ভাড়া তিন টাকা ও তৃতীয় শ্রেণির ভাড়া এক টাকা। স্টেশন শব্দটির পরিবর্তে আড্ডা শব্দটি ব্যবহার করা হয়েছে।[১২]

'ধর্মনীতি' (১৮৫৬) ও 'পদার্থবিদ্যা' (১৮৫৬)- বিভিন্ন ইংরেজি গ্রন্থ অবলম্বনে লিখিত 'ধর্মনীতি' গ্রন্থটি ভাষার প্রাঞ্জলতা ও বিষয় অনুযায়ী ভাবগম্ভীর গদ্যের একটি উৎকৃষ্ট উদাহরণ। 'পদার্থবিদ্যা' গ্রন্থটি সেই সময় অত্যন্ত জনপ্রিয় হয়েছিল। এটি বাংলা ভাষায় প্রথম বিজ্ঞান-বিষয়ক গ্রন্থ। জড় ও পদার্থ, পরমাণু আকর্ষণ, প্রবাহ প্রভৃতি পদার্থবিদ্যার বিষয়ে আলোচনার পাশাপাশি মৎস, পুষ্প, কৃমি প্রভৃতি বিষয়েরও আলোচনা আছে।

অক্ষয়কুমারের অক্ষয় কীর্তি 'ভারতবর্ষীয় উপাসক সম্প্রদায়' প্রথম ভাগ প্রকাশিত হয় ১৮৭০-এ, দ্বিতীয় ভাগ ১৮৮৩ তে। এইচ. এইচ. উইলসনের হিন্দু রিলিজিয়াস সেক্টস্ এর অনুসরণে অক্ষয়কুমার এ গ্রন্থটির পরিকল্পনা করেন বলে অনেকেই মনে করেন। তবে অক্ষয়কুমার সম্পূর্ণ নতুনভাবে এই গ্রন্থটির পরিকল্পনা করেন। নিজের চেষ্টায় 'ভক্তমাল' নামক হিন্দি গ্রন্থের মূল সূত্র গুলিকে গ্রথিত করে ২২ টি উপাসক সম্প্রদায়ের বিবরণ দিয়েছেন। বিঠল্ , কর্ত্তাভজা, বাউল, ন্যাড়া, সাঁই দরবেশ, বলরামী প্রভৃতি আরও ২২ টি উপাসক সম্প্রদায়ের বিবরণ লিপিবদ্ধ করেছেন। এছাড়া বিলুপ্তপ্রায় ধর্মীয় সম্প্রদায় সম্পর্কেও পাঠককে জ্ঞাত করেছেন। বাংলা ভাষায় জীবনাশ্রয়ী ধর্মবোধের সংজ্ঞা নির্ণয় করে মৌলিক গবেষণার ইতিহাস সৃষ্টি করেছেন। ঊনবিংশ শতাব্দীর অন্যতম শ্রেষ্ঠ লেখকরূপে অক্ষয়কুমার বিশেষ স্থান পাওয়ার যোগ্যতা অর্জন করেছেন। অক্ষয়কুমারের মতে ভারতবর্ষের উপাসক সম্প্রদায়ের মূল সম্প্রদায় পাঁচটি ভাগে বিভক্ত- শাক্ত, শৈব, বৈষ্ণব, সৌর ও গাণপত্য। অন্যান্য যেসব সম্প্রদায়ের কথা উল্লেখ আছে তা উল্লেখিত সম্প্রদায়ের শাখা প্রশাখা মাত্র। শুধু উপাসক সম্প্রদায় নয়, তিনি হিন্দু ও হিন্দু ধর্মের মূল অনুসন্ধানেও নিজস্ব মতের স্বপক্ষে যুক্তি দিয়েছেন। প্রথম ভাগের উপক্রমণিকায় তিনি লিখেছেন "হিন্দুধর্মের মূল অনুসন্ধান করিতে হইলে ভারতবর্ষ হইতে বহির্গত হইয়া বর্ষান্তরে বিচরণ করিতে হয়। হিন্দুরা ভারত ভূমির আদিম নিবাসী ছিলেন না, দেশান্তর হইতে আগমন করিয়া এই স্থানে অবস্থিত হইয়াছেন।[১৩] "ভাষাতাত্ত্বিক প্রমাণ উপস্থিত করে বক্তব্য ও সিদ্ধান্ত সমর্থনে লিখেছেন ল্যাটিন, গ্রীক, কালটিক, টিউটনিক, সুলেমনিক, হিন্দু, পারসিক ইত্যাদি বিভিন্ন বংশীয় বিভিন্ন জাতি একটি মূল জাতি থেকেই উৎপন্ন হয়েছে। সমস্ত জাতির ভাষায় বিভিন্ন শব্দের এমন কিছু সাদৃশ্য বা মিল আছে যে একসময় প্রত্যেক জাতি একভাষী ও এক জাতি নিবিষ্ট না থাকলে কোনক্রমেই তা সংঘটিত হতে পারে না। আজকের জাতিগত ও সম্প্রদায়গত বা অর্থনৈতিক গত দাঙ্গা হাঙ্গামা বা আগ্রাসনের অস্থির সময় অক্ষয়কুমারের এই প্রামাণ্য গবেষণামূলক বক্তব্যটি যথেষ্ট প্রণিধানযোগ্য।

অমরকোষ, মনুসংহিতা, ঋকবেদ, অথর্ববেদ, ভক্তমাল, মেরুতন্ত্র প্রভৃতি গ্রন্থ থেকে অনেক উদ্ধৃতি লেখক ব্যবহার করে আপন বক্তব্য সমর্থন করেছেন।

শুধু ধর্মনীতি, বিজ্ঞান, শিক্ষা, নীতিশিক্ষা নয়, সমকালীন অর্থনৈতিক বিষয়েও অক্ষয়কুমার যথেষ্ট ওয়াকিবহাল ছিলেন। ভারতবাসীর যে অনেক বেশি অর্থের বা আয়ের প্রয়োজন আছে, জীবনধারণের জন্য বিভিন্ন আয়ের উৎসের প্রয়োজনীয়তা তিনি অনুভব করেছেন। স্বদেশপ্রীতি ও রামমোহন রায় প্রসঙ্গে তাঁর মন্তব্যটি বিশেষ উল্লেখযোগ্য-

"তুমি আপন সময়ের অতীত বস্তু। কেবল সময়েরই কেন ? আপন দেশেরও অতীত। ভারতবর্ষ তোমার যোগ্য নিবাস নয়। কে ব্যক্তি বলিয়া গিয়েছেন এরূপ দেশে এরূপ লোকের জন্মগ্রহণ অবনীমন্ডলে আর কখনো ঘটিয়াছিল বোধ হয় না। সহমরণ নিবারণ ব্রাহ্মধর্ম স্থাপন, দেশীয় লোকের পদোন্নতি সাধন ইত্যাদি তোমার কত জয়স্তম্ভ ও কীর্তিস্তম্ভ জাজ্জ্বল্যমান রহিয়াছে। না জানি কি কল্যাণময়ী মহীয়সী কীর্তি সংস্থাপন উদ্দেশ্যে অর্ধভূমন্ডল অতিক্রম করিতে কৃতসংকল্প ও প্রতিজ্ঞারূঢ় হইয়াছিলে।"(ভারতবর্ষীয় উপাসক সম্প্রদায়, উপক্রমণিকা, পৃ. ৩৮-৩৯)

অক্ষয়কুমারের গদ্যভাষা সম্বন্ধে বলা যায়, বিষয় অনুযায়ী ভাষা ব্যবহারে তিনি যথেষ্ট সচেতন ছিলেন। বাংলা গদ্যের প্রথম যুগের অনুশীলনে তিনি বিদ্যাসাগরের গদ্য ভাষার সারল্য ও প্রাঞ্জলতায় বিশ্বাসী ছিলেন, বিশেষত বিজ্ঞানধর্মী রচনার ক্ষেত্রে তাঁর ভাষার গভীরতা ও পরিমিতিবোধ যথেষ্ট সাবলীল ছিল। বিভিন্ন দুরূহ ও অপ্রচলিত বিদেশী শব্দের পরিভাষা প্রস্তুত করতে তাঁর দান আজও শ্রদ্ধার সঙ্গে স্বীকার করতে হবেই। অক্ষয়কুমারের রচনারীতি বা স্টাইলের আলোচনায় প্রথমেই বিশ্লেষণ করতে হবে তাঁর ভাষার বিশ্লেষণ শৈলী মূলত: তৎসম ও অর্ধ-তৎসম শব্দের প্রতি তাঁর প্রবণতা ছিল।

"এইরূপ সুস্নিগ্ধ সময়ে আমি তথায় এক পাষাণ খন্ডে উপবিষ্ট হইয়া আকাশমন্ডল নিরীক্ষণ করিতে করিতে জগতের আদি-অন্ত, কার্যকারণ, সুখ-দুঃখ, কর্মাকর্ম-সমুদয় মনে মনে পর্যালোচনা করিতেছিলাম। ইতিমধ্যে জলকল্লোলের কলকল ধ্বনি, বৃক্ষপত্রের শরশর শব্দ ও সুশীতল সমীরণের সুন্দর হিল্লোল দ্বারা আমার প্রাণে পরম সুখানুভাব হইয়া মনোবৃত্তি সমুদার ক্রমে ক্রমে অবসন্ন হইয়া আসিল এবং এই অবসরে নিদ্রা আমার অজ্ঞাতসারে নয়নদ্বয় নির্মীলিত করিয়া, আমাকে অভিভূত করিয়া বসিল। আমার বোধ হইল, যেন এক বিস্তীর্ণ নিবিড় অরণ্যে প্রবেশ করিয়া ইতস্তত ভ্রমণ করিতেছি।" (চারুপাঠ,৩য় খন্ড, পৃ. ১২)

আবার বিজ্ঞান বিষয়ক রচনায় তৎসম শব্দের ব্যবহারে যে গাম্ভীর্য সৃষ্টি হয়, তা পরিহার করে সাধারণ গদ্যরীতির আশ্রয় নিয়েছেন। অক্ষয়কুমার ইংরেজি ভাষায় লিখিত বিজ্ঞান বিষয়ক গ্রন্থাদির অনুসরণ করেছিলেন, তাই বিজ্ঞানশাস্ত্রের পরিভাষাও তাঁকেই সৃষ্টি করে নিতে হয়েছিল।

"প্রথমেই লিখিত হইয়াছে সূর্য যেমন নিজে তেজোময়, চন্দ্র সেরূপ নয়, সূর্যের রশ্মি পাইয়া চন্দ্র প্রকাশ। সূর্যগ্রহণের সময় চন্দ্রের যে ভাগ সূর্যের দিকে থাকে, সে ভাগ সূর্যরশ্মি পাইয়া প্রকাশিত হয়। আবার যে ভাগ আমাদের দিকে থাকে, সে ভাগ ঐ রশ্মি না পাওয়াতে অপ্রকাশিত থাকে। এই নিমিত্ত সে সময়ে আমরা চন্দ্রও দেখতে পাই না। পৃথিবী ও চন্দ্রের গতির যেরূপ নিয়ম নিরূপিত' আছে। তদানুসারে কোন কোন অমাবস্যাতে চন্দ্র, পৃথিবী ও সূর্যের মধ্যস্থলে আইসে, এই নিমিত কেবল সেই অমাবস্যাতেই সূর্যগ্রহণ হইয়া থাকে। সকল অমাবস্যাতেই চন্দ্র পৃথিবী ও সূর্যের সেইরূপ মধ্যবর্ত্তিনী হয় না, সুতরাং সূর্য চন্দ্রের দ্বারা আচ্ছন্ন হয় না। এই নিমিত্ত সকল অমাবস্যাতে সূর্যগ্রহণ ঘটে না।" (চারুপাঠ,৩য় খন্ড, পৃ.৭৮-৭৯)

অতি সাবলীল ভাষায় বিজ্ঞানের সূক্ষ্ম তত্ত্বকে বিশ্লেষণ করেছেন। পরিভাষার ক্ষেত্রেও তাঁর অবদান অনস্বীকার্য। ধর্ম বা নীতি বিষয়ক বা ভূগোল বিষয়ক বা বিজ্ঞান বিষয়ের সব ক্ষেত্রেই তাঁর পরিভাষা প্রয়োগ অত্যন্ত প্রশংসনীয়। একটি উদাহরণ দিলেই বিষয়টি পরিষ্কার হয়ে যাবে-

চুম্বক—Magnet, উদ্ভিদবিদ্যা—Botany, দিকদর্শন—Compass, জ্যোতিষ—Astrology, উপত্যকা—Valley, ইতিহাসবেত্তা—Historian, টঙ্কশালা—Mint, প্রাকৃতিক ইতিবৃত্ত—Natural History, পান্থশালা—Hotel, তড়িৎ—Electric, প্রাণিবিদ্যা—Biology ইত্যাদি ।

অক্ষয়কুমারের গদ্যকে বলা যায় চিন্তাশীলতার গদ্য। বিষয় নির্বাচন অনুযায়ী তা অলংকার ও আবিলতাহীন এবং নির্মেদ। যুক্তি ও বিচার বুদ্ধি দ্বারা নিয়ন্ত্রিত অক্ষয়কুমার বাংলা গদ্যসাহিত্যের চিন্তার সুশৃংখল বিস্তার দ্বারা বিজ্ঞান চিন্তাকে আবেগ বর্জিত করে সরল ও সঠিক উপস্থাপনা করেছেন। প্রবন্ধ বা গদ্য সাহিত্যের প্রারম্ভিক যুগের তিনি ছিলেন যথার্থ পথপ্রদর্শক।

দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর— স্বনামধন্য বিশ্বকবি রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের পিতৃদেব দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর (১৮১৭-১৯০৫) বাংলা গদ্যসাহিত্যের ইতিহাসে একটি স্মরণীয় ভূমিকা গ্রহণ করেছেন। তাঁর রচিত গদ্যভাষা মননশীল ও অত্যন্ত বিষয়ানুগ হয়ে পরিমার্জিত রূপ গ্রহণ করে। অক্ষয়কুমার দত্ত ও দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর উভয়েই তত্ত্ববোধিনী পত্রিকার সঙ্গে ঘনিষ্ঠভাবে সম্পৃক্ত ছিলেন। অক্ষয়কুমার যেমন জ্ঞানের অনুশীলন ও বৈজ্ঞানিক অনুসন্ধানে ও চিন্তার আলোচনায় ব্যাপৃত ছিলেন, তেমনই দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর তার রচনায় সূক্ষ্ম কল্পনা ও আধ্যাত্মিক অনুভূতির এবং প্রাকৃতিক দৃশ্যের অপরূপ বর্ণনায় গদ্যসাহিত্যকে সমৃদ্ধ করেছেন। রামমোহন রায়ের যুক্তিগ্রাহ্য ধর্ম আলোচনা দেবেন্দ্রনাথের আবেগময় ভক্তি ও অধ্যাত্মরসে সিক্ত হয়েছে।

উনিশ শতকের শেষভাগ থেকেই দেশীয় ইতিহাস ও সংস্কৃতি প্রভৃতির আলোচনার ফলে আমাদের দেশের স্বদেশী ভাবনাচিন্তার অবকাশ ঘটে। মূলতঃ 'তত্ত্ববোধিনী পত্রিকা' বাংলায় এই স্বদেশী ভাবনার ক্ষেত্রে বিশেষ ভূমিকা গ্রহণ করে। অক্ষয়কুমার দত্ত মহাশয় ঐ পত্রিকাতে ভারতের অতীত গৌরব কাহিনী পরিবেশন করে জনসাধারণের মনে সর্বপ্রথম দেশানুরাগ উদ্দীপিত করেছিলেন।

'তত্ত্ববোধিনী' পত্রিকা প্রকাশিত হওয়ার কিছুকাল পরেই সিপাহী বিদ্রোহ এবং নীল বিদ্রোহের দ্বারা বাঙালি জনজীবন বিক্ষুব্ধ ছিল, এই সময় কয়েকজন উৎসাহী দেশপ্রেমিকদের দ্বারা হিন্দুমেলা বা স্বদেশী মেলার সূচনা ঘটে। বাংলার বহু স্বনামধন্য পরিবার ও ঠাকুর পরিবার এই মেলার প্রধান পৃষ্ঠপোষক ও উদ্যোক্তা ছিলেন। শুধু হস্তচালিত কুটির শিল্প বা দেশীয় সামগ্রী বিক্রি করাই এই মেলার উদ্দেশ্য ছিল না; স্বদেশী সংগীত, কবিতা, নাটক রচনা ও পরিবেশন করে ভারতের যশোগান করে এবং ভারতের অতীত কীর্তির সঙ্গে বর্তমানের পরাধীন ভারতের তুলনা করে নূতন জাতীয়তাবোধে জাতিকে জাগ্রত করার যথেষ্ট প্রয়াস লক্ষিত হয়েছিল।

'তত্ত্ববোধিনী পত্রিকা' এই স্বদেশীয়ানার উৎসাহে বিভিন্ন বিদগ্ধ লেখকদের রচনা প্রকাশ করে। তার মধ্যে রাজনারায়ণ বসু (শ্রী অরবিন্দ ঘোষের মাতামহ), বিদ্যাসাগর, রাজেন্দ্রলাল মিত্র, আনন্দকৃষ্ণ বসু, প্রসন্নকুমার সর্বাধিকারী, শ্রীধর ন্যায়রত্ন, রাধাপ্রসাদ রায় প্রভৃতি উল্লেখযোগ্য। দেবেন্দ্রনাথ তত্ত্ববোধিনী সভার বিভিন্ন অধিবেশনে যে সকল ভাষণ দেন তা এই পত্রিকাতেই প্রকাশ করা হতো।

দেবেন্দ্রনাথের রচনার অধিকাংশ হল ধর্ম বিষয়ক বক্তৃতা, যা মূলতঃ বক্তৃতা বা উপদেশ। এছাড়া আত্মজীবনী ও পত্রসাহিত্যের ক্ষেত্রেও তাঁর প্রতিভার স্বাক্ষর উপলব্ধি করা যায়। প্রথমে তাঁর ধর্ম বিষয়ক রচনাবলী নিয়ে আলোচনা করা যেতে পারে। যথা- ব্রাহ্মধর্মগ্রন্থ (১৮৫০), ব্রাহ্ম ধর্মগ্রন্থ বঙ্গানুবাদ সহ ১ম ও ২য় ভাগ(১৮৫১), আত্মতত্ত্ববিদ্যা(১৮৫২), ব্রাহ্মধর্মের মত ও বিশ্বাস(১৮৬০), পশ্চিম প্রদেশের দুর্ভিক্ষ উপশমে সাহায্য সংগ্রহার্থে

ব্রাহ্ম সমাজের বক্তৃতা(১৮৬১), কলিকাতা ব্রাহ্মসমাজের বক্তৃতা(১৮৬২), ব্রাহ্মবিবাহ প্রণালী(১৮৬৪), ব্রাহ্মধর্মের অনুষ্ঠান পদ্ধতি(১৮৬৫), ভবানীপুর ব্রাহ্ম বিদ্যালয়ের উপদেশ(১৮৬৫-৬৬), ব্রাহ্ম ধর্মের অনুষ্ঠান পদ্ধতি(১৮৬৫), ব্রাহ্মধর্মের পরিশিষ্ট (১৮৮৫), উপহার(১৮৮৭), জ্ঞান ও ধর্মের উন্নতি(১৮৯৩) পরলোক ও মুক্তি (১৮৯৫) ইত্যাদি।[১৫] এসব গ্রন্থগুলি ধর্ম বিষয়ক আলোচনায় সমৃদ্ধ। বলতে গেলে ধর্মচিন্তাই দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুরের গদ্য রচনার মূল প্রেরণা বা উৎস। লেখক হিসেবে অক্ষয়কুমার ও দেবেন্দ্রনাথ এর স্বভাব পার্থক্যের বীজ এখানেই নিহিত আছে। অক্ষয়কুমার বিজ্ঞানমনস্ক মানবতাবাদী অপরজন ধর্মবিশ্বাসী ঈশ্বরবাদী। অক্ষয়কুমার বাস্তববাদে বিশ্বাসী, দেবেন্দ্রনাথ ততটাই হৃদয়ধর্মী। রামমোহনের ধর্মবোধ যতখানি শাস্ত্রীয় বিচারধর্মী ছিল, দেবেন্দ্রনাথ এর ধর্মবোধ ছিল ততখানি হৃদয়ের রসে জারিত সাধকের অনুভব ও বিশ্বাস। রামমোহন পৌত্তলিকতায় বিশ্বাস করতেন না। তিনি একেশ্বরবাদী ছিলেন। তাই তাঁর ধর্মবোধ ছিল বিশ্বজনীন। তিনি সমস্ত মানবের মুক্তির জন্য বিশ্বের তাবৎ মানবের সংস্কার, মনের স্বাধীনতা ও আত্মার মুক্তি কামনা করতেন। দেবেন্দ্রনাথও ধর্ম চিন্তায় একেশ্বরবাদে বিশ্বাস করলেও রামমোহনের মতই বিশ্বজনীন ধর্মবোধের সঙ্গে একাত্ম ছিলেন।

এখানেই ব্রাহ্মবাদে বিশ্বাসী হলেও দেবেন্দ্রনাথ বোধহয় একটু রক্ষণশীল বা ঐতিহ্য-এ বিশ্বাস করতেন। দেবেন্দ্রনাথের ধর্মমূলক রচনাগুলি তাই একজন ঈশ্বর সাধকের আবেগপ্রবণ মন থেকে উৎসারিত হওয়া স্নিগ্ধ অনুভূতির কাব্যরূপ।

'ব্রাহ্মধর্ম' (১৮৫০) বাংলা সাহিত্যে একটি গুরুত্বপূর্ণ গ্রন্থ। এই গ্রন্থে ব্রাহ্মধর্মের মূল মন্ত্রটি বিধৃত হয়েছে। তাঁর ব্রাহ্মধর্ম প্রচারের বিধি বা পদ্ধতিটি খৃস্টান প্রচারকদের মতই সমবেত প্রার্থনা সংগীতের অনুগামী ছিল। যদিও দেবেন্দ্রনাথ সম্পূর্ণভাবে খৃস্টান ধর্মবিরোধী ছিলেন তবুও উনিশ শতকের নবজাগরণের জোয়ারে এই প্রভাব যথেষ্ট যুক্তিগ্রাহ্য ও সংবেদনশীল ছিল।

একেশ্বরবাদী দেবেন্দ্রনাথ ঈশ্বরকে মানবপিতা, বিশ্বপিতা রূপে বর্ণনা করেছেন। পাশ্চাত্যে ঈশ্বরকে বিশ্বপিতা বা মানবপিতা হিসেবে মান্য করা হয়। দেবেন্দ্রনাথ পাশ্চাত্যের সেই ঐশ্বরিক ভাবধারাকে ব্রাহ্মধর্মের প্রচারে ব্যবহার করেন। পার্থক্য শুধু ভাষায় ও প্রকাশভঙ্গীতে। একটি উদাহরণ দিলেই তা সুস্পষ্টভাবে বোঝা

যাবে। সংসারের কর্মকাণ্ডের সঙ্গে এই 'পিতা'কে সম্পৃক্ত করে দেখার গভীর দৃষ্টি ও মনোনিবেশ দেবেন্দ্রনাথের লেখায় লক্ষ্য করা যায়-

"হে বিশ্ববিধাতা, জগৎপিতা ! তোমারই প্রসাদে বায়ু মধু বহন করিতেছে, সমুদ্র মধু ক্ষরণ করিতেছে, আবার তোমারই প্রসাদে ওষধি বনস্পতি সকল মধুমান হউক, গো সকল সুমধুর দুগ্ধ দান করুক"। [১৬]

পংক্তিগুলি উপনিষদের 'মধুবাতা ঋতায়তে, মধু ক্ষরন্তি সিন্ধব' শ্লোকের সঙ্গে অনিবার্যভাবে মিলে যায়।

দেবেন্দ্রনাথের ব্রাহ্মধর্ম বিষয়ক রচনাগুলি অধিকাংশই ধর্মীয় উপদেশ, তত্ত্ব বা বক্তৃতাবিষয়ক। এই ধর্ম বিষয়করচনাগুলি বা বক্তৃতাগুলি সাধারণ অর্থে সাহিত্য বলতে যা বুঝি ঠিক সেই সমপর্যায়ের বলা যায় না। তবে ভাষার সাবলীলতা, শব্দ, বাক্য ও বিরামচিহ্নের সঠিক ব্যবহারজনিত ও সুষম বাক্যবিন্যাসের ঐশ্বর্যে অতুলনীয়। যে কোন ভালো গদ্যের রচয়িতা নিরপেক্ষ ও চিন্তার স্বাধীনতায় মুক্ত থাকেন, দেবেন্দ্রনাথের ধর্মবিষয়ক রচনাসমূহ এই পরিস্থিতিবোধকে মর্যাদা দিয়েছে।

বাংলা সাহিত্যে দেবেন্দ্রনাথের স্থান আরও দুটি কারণে উল্লেখযোগ্য। আত্মজীবনীকার ও পত্রসাহিত্যিকরূপে তাঁর পরিচিতি স্বতন্ত্র ধরণের। বাংলা গদ্যের জন্মের শুরু থেকেই তা বিষয়বৈচিত্র্যে সমৃদ্ধ হয়ে ওঠে। তবু একটি কথা বলতে হবে যে শুধু বিষয় বৈচিত্র্যই নয়, বিষয়কে সাহিত্য পদবাচ্য করে তুলতে হলে তার রস-বৈচিত্র্যের কথাও স্মরণ রাখতে হবে। বাংলা গদ্যের বিষয়-বৈচিত্র্যের সঙ্গে রস-বৈচিত্র্যের সুষম সংযোগ ঘটতে বেশ কিছু সময়ের ব্যবধান ঘটেছিল। রামমোহনের গদ্য ঋজু ও বিষয়ধর্মী হলেও পাণ্ডিত্যপূর্ণ এবং তাতে সাহিত্যের নিগূঢ় রসটি পরিবেশিত হয়নি।

অক্ষয়কুমারের গদ্যে, বা বিদ্যাসাগরের গদ্যে তা অনেকটাই সাহিত্যরসে জারিত হয়েছে, আর দেবেন্দ্রনাথের গদ্য বিষয়বৈচিত্র্যের সঙ্গে সঙ্গে ব্যঞ্জনাধর্মী সাহিত্যরসে পরিপূর্ণতা লাভ করেছে। তার প্রমাণ তাঁর পত্রসাহিত্য। পত্ররচনা যে এমন উজ্জ্বল রসসিক্ত সাহিত্যধর্মী হতে পারে তা দেবেন্দ্রনাথের পত্রাবলী আলোচনা করলেই বোঝা যাবে। এই পত্র সাধারণত ব্যক্তিগত বিষয়ে বিশ্বের বহু বিখ্যাত ব্যক্তির লেখা পত্র বা পত্রাবলী বিশেষ বিশেষ কারণে যত্ন সহকারে সংরক্ষিত ও পঠিত হতে দেখা যায়। আধুনিক গবেষণাধর্মী রচনায় পত্রসাহিত্যের বিশেষ

গুরুত্ব আছে; পত্র বা পত্রাবলীর মাধ্যমে লেখক ও উদ্দিষ্ট ব্যক্তির ব্যক্তিত্ব, জ্ঞানের গভীরতা, সমাজ, দেশকাল, অর্থনীতি, ইতিহাস, চিন্তা ও দর্শনের বিভিন্ন দিকের সম্বন্ধে জ্ঞান আহরণ করা যায়। তাই ডক্টর জনসনের পত্র, বায়রণের পত্র, রমা রঁলার পত্র, সমারসেট মমের পত্র, শেক্সপিয়রের পত্র, কীটসের পত্র, রোজেনবার্গের পত্রগুচ্ছ প্রভৃতি পাশ্চাত্য মনীষীদের সঙ্গে স্বামী বিবেকানন্দের পত্রাবলী, রবীন্দ্রনাথের পত্রগুচ্ছ, প্রমথ চৌধুরী-ইন্দিরাদেবীর পত্রাবলী প্রভৃতি পত্রাবলী সাহিত্যের রসসম্ভারে সমৃদ্ধ হয়ে বাংলা সাহিত্যের ক্ষেত্রে একটি বিশিষ্ট ভূমিকা গ্রহণ করেছে। তাই পত্রসাহিত্য একাধারে যেমন ব্যক্তিমনের প্রকাশ, অপরদিকে সাহিত্যের একটি সম্পদও বটে। সুতরাং ব্যক্তিগত পত্রাবলী ঘরোয়া কথাপ্রসঙ্গ থাকা সত্ত্বেও সাধারণ পাঠকের মনে রসানুভূতির সৃষ্টি করে। এই বিপুল সাহিত্য রসসমৃদ্ধ লেখাই পত্রকে পত্রসাহিত্য রূপে পরিগণিত করতে পারে।

দেবেন্দ্রনাথের পত্রলেখার কাল ১৮৫০-১৮৮৭ পর্যন্ত প্রসারিত। তাঁর লিখিত পত্রগুলি অনেক ক্ষেত্রেই পত্রসাহিত্য হয়ে উঠেছে। তাঁর লেখা বহু পত্রেই তাঁর ব্যক্তিগত জীবনের গার্হস্থ্য কথাবার্তার পরিবর্তে পরিস্ফুটিত হয়েছে তাঁর জীবন ও জগৎ সম্বন্ধে ধারণার কথা, প্রাকৃতিক সৌন্দর্যে মুগ্ধ মনের অনাবিল আনন্দের অনুভূতি। এই সমস্ত ব্যক্তিগত অনুভূতি ব্যক্তিমনের ঊর্ধ্বে সার্বজনীন অনুভূতি সৃষ্টিতে সক্ষম হয়েছে। প্রিয়নাথ শাস্ত্রী দেবেন্দ্রনাথ লিখিত কতকগুলি চিঠির সঙ্গে তাঁকে লেখা কেশবচন্দ্র সেনের দশখানি চিঠি, দ্বারকানাথ ঠাকুরের লেখা একটি ইংরেজি পত্র, ইত্যাদি নিয়ে একটি সংকলন প্রকাশিত করেন। বেশিরভাগ চিঠিই ১৮৫০-১৮৮৭ সালের মধ্যে লেখা হয়েছিল। এই ১৪৬টি পত্রের সংকলনগ্রন্থে দেবেন্দ্রনাথ লিখিত পত্রের সংখ্যা ১৩৪টি। অধিকাংশ পত্রই তিনি রাজনারায়ণ বসুকে লিখেছিলেন, এছাড়া প্রতাপচন্দ্র মজুমদার, সৌদামিনী দেবী, নবকান্ত চট্টোপাধ্যায়কে লেখা কিছু চিঠিও এই সংকলনে আছে। সৌদামিনী দেবীকে লেখা একটি পত্র থেকে উদ্ধৃত করা যেতে পারে-

"এই পর্বতের উপরে আজকাল মেঘ, বাতাস, বিদ্যুৎ বজ্র মুহুর্মুহু আনন্দে খেলা করিতেছে। সে খেলা দেখে কে ? দিন দুই প্রহরেই দেখিতে দেখিতে কোমল গান্ধার ছায়ার ন্যায় মেঘের ছায়া পর্ব্বতের উপরে পড়িল, আবার পরক্ষণেই সেই মেঘকে ভেদ করিয়া সূর্য্যের কিরণ হাসিতে হাসিতে ছড়াইয়া পড়িল। আবার কিছু পরে

এমনি বাষ্প উঠিয়া সকল পর্ব্বতকে আচ্ছন্ন করিল, যেন একেবারে সকল সৃষ্টির লোপ হইল, আবার পরক্ষণেই সম্মুখে উজ্জ্বল সবুজবর্ণ বনরাজি দীপ্তি পাইতে লাগিল। ইহা ঈশ্বরের একটি বিচিত্র কার্য্যক্ষেত্র। তাঁহার কার্য্যের বিরাম নাই, তাঁহার মহিমা যখন দেখিতে থাকি তখন সকলি আর ভুলিয়া যাই। ঈশ্বর তোমাদের সকলকে কুশলে রাখুন এই আমার স্নেহপূর্ণ আশীর্বাদ ইতি-”।[১৭]

পত্রগুলিতে প্রকৃতির স্বাভাবিক সৌন্দর্যবর্ণনা ঈশ্বরের অনুভূতিতে রূপান্তরিত হয়েছে। চিঠিপত্রে প্রাকৃতিক সৌন্দর্য বর্ণনার সঙ্গে সঙ্গে ঈশ্বর বা বিশ্ববিধাতার আনন্দময় অনুভব সৃষ্টি করেছেন। ভাষা-সম্পদে বাংলা সাহিত্যে এই পত্রগুলির স্থান বিশেষ উল্লেখযোগ্য। কেবল ভাষার সম্পদে নয়, অলংকরণের ঐশ্বর্যে, প্রাকৃতিক নির্মল সৌন্দর্য বর্ণনায়, ঐশ্বরিক অনুভূতিতে ও ধর্ম বিষয়ক সাহিত্য-কল্পে, সুষম অভিব্যক্তিতে দেবেন্দ্রনাথের পত্রাবলীর মূল্যায়ন শেষ হয়না। যে সাহিত্যরস রবীন্দ্র রচনা ও তাঁর পত্রাবলীকে উর্বর করে তুলেছিল তাঁর উৎসমূলে দেবেন্দ্রনাথের এই পত্রগুলির অবদান অস্বীকার করা যায় না। বাংলা পত্রসাহিত্য ধারায় দেবেন্দ্রনাথের পত্রাবলী তাই গদ্যের ব্যবহারে, সৌন্দর্যের অপার বর্ণনায়, অধ্যাত্মচেতনার অনুভূতি এবং সুষম ব্যক্তিচেতনার গভীরতায় এক অতুলনীয় সম্পদ বলা চলে।

বাংলা গদ্যসাহিত্যে আত্মজীবনী বা আত্মচরিত রচনার ইতিহাস যে খুব প্রাচীন তা বলা চলে না। উনিশ শতকের আগে বাংলা সাহিত্যে যে সব জীবনীগ্রন্থ লেখা হয়েছিল তা সবই পদ্যে। সেসব জীবনীগ্রন্থের মূল উপজীব্য বিষয় বা ব্যক্তিত্ব ছিলেন মহাপ্রভু শ্রীচৈতন্যদেব। তাঁর ধর্মীয় ব্যক্তিত্বময় জীবন নিয়ে দৈবী মহিমা ও অলৌকিক কাহিনীর বিবরণ দেওয়াই ছিল এই জীবনীকাব্যগুলির উৎস। বৃন্দাবনদাসের চৈতন্যভাগবত বা কৃষ্ণদাস কবিরাজের শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত গ্রন্থে শ্রীচৈতন্যের জীবন কাহিনী বিবৃত হয়েছে সত্য তবে তা বিশেষ ধর্মসম্প্রদায়ের ভক্তিমূলক বর্ণনা এবং এই গ্রন্থগুলি আত্মজীবনী সংজ্ঞার পরিপূরক নয়। ভক্তিবাদী আন্দোলনের মুখপাত্র মাত্র বলা যায়। তাই জীবনীসাহিত্যের যে ব্যঞ্জনাময় রসগ্রাহিতা তার উপস্থিতি দেখা যায় না।

বাংলা গদ্যে রচিত রামরাম বসুর 'রাজাপ্রতাপাদিত্য চরিত' (১৮০১) ও রাজীবলোচন মুখোপাধ্যায় রচিত 'মহারাজা কৃষ্ণচন্দ্র রায়স্য চরিত্রম্' (১৮০৫) জীবনচরিত সম্বন্ধীয় উল্লেখযোগ্য গ্রন্থ। গ্রন্থদুটিতে মূল চরিত্রের

বংশপরিচয় ও বংশতালিকা উল্লেখ করা হয়েছে। এছাড়াও কৃষ্ণমোহন বন্দোপাধ্যায়ের, 'গ্যালিলিও চরিত্র এবং যুধিষ্ঠির', 'বিক্রমাদিত্য', 'প্লেটো', 'আলফ্রেড' প্রভৃতি ব্যক্তিত্বদের নিয়ে রচিত 'জীবনবৃত্তান্ত' (১৮৫১-৫২) এবং বিদ্যাসাগরের 'চরিতাবলী' (১৮৪৬) গ্রন্থ বিশেষ উল্লেখের দাবী রাখে। বাংলা গদ্যের ইতিহাসে এসব রচনাগুলি অবশ্যই জীবনী সাহিত্য নয়। একথা মনে রাখা দরকার যে জীবনীগ্রন্থ রচনা ও আত্মজীবনী রচনা সম্পূর্ণ পৃথক বিষয়। আত্মজীবনীকারের রচনা নিরপেক্ষ, পরিমিতিবোধ, গ্রহণ ও বর্জন ও রসবোধ সর্বোপরি সত্য-অসত্যের দ্বন্দ্বটি সম্বন্ধে পরিষ্কার ধারণা থাকা আবশ্যক হয়, তা না হলে জীবন চরিত রসহীন এক রোজনামচায় পরিণত হবে।

দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুরের আত্মজীবনী (১৮৯৮) বাংলা আত্মজীবনীমূলক গ্রন্থের ক্ষেত্রে এক অনুপম ও অতুলনীয় সংযোজন। এই গ্রন্থটি একাধারে এক ঈশ্বরবিশ্বাসী সাধকজীবনের কথা ও সাহিত্য রসসমৃদ্ধ প্রতিভার স্বাক্ষর। এই গ্রন্থে সে যুগের ধর্ম, শিক্ষা, সংস্কৃতি ও ও রাজনীতিরও যেমন সরস বর্ণনা করেছেন, তেমনি এই বর্তমান সভ্যতার উত্থান-পতনের ইতিহাস এবং তাঁর জীবনের চরম ও পরমলক্ষ্য ব্রহ্মস্বরূপ আস্বাদনের যে আনন্দময় অনুভূতি তার অকপট বর্ণনা দিয়েছেন। একদিকে যেমন নবজাগরণের পরিবেশে বাংলা তথা অখণ্ড ভারতবর্ষের ধর্ম, শিক্ষা ও সংস্কৃতির পরিচয় দিয়েছেন, অপরদিকে অতীন্দ্রিয় ঈশ্বরসাধনায় আত্মমগ্ন হয়েও বাংলা ভাষার মাধ্যমে স্বদেশে শিক্ষাবিস্তারের প্রয়োজনীয়তা উপলব্ধি করেছেন। পুরাতন ঐতিহ্যের প্রতীক বেদ-পুরাণ, উপনিষদের চর্চার সঙ্গে সঙ্গে আমাদের আধুনিক শিক্ষা ও সংস্কৃতির মেলবন্ধন ঘটাবার চেষ্টা করেছেন। খ্রীষ্টধর্মের আগ্রাসী প্রচারের পরিকল্পনার প্রচেষ্টা থেকে হিন্দুধর্ম ও সমাজকে রক্ষার জন্য অগ্রসর হয়েছেন। তত্ত্ববোধিনী সভা (১৮৩৯), তত্ত্ববোধিনী পত্রিকা (১৮৪৩) পত্রিকা প্রকাশ ও প্রচার করে হিন্দুধর্মের পৌত্তলিকতার বিরোধিতা করেছেন। দেবেন্দ্রনাথের আত্মজীবনী ব্যক্তিজীবন অপেক্ষা তাঁর অন্তরাত্মার বাণীরূপে প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। তাঁর দৃষ্টিগোচরে তাই প্রকৃতি অনাবিল সৌন্দর্যের পসরা নিয়ে উপস্থিত হয়েছে। তিনি প্রকৃতিকে ভালবেসেই বাংলা থেকে বিহার, বিহার থেকে পাঞ্জাব, শিমলা, অমৃতসর, কাশ্মীর, হিমাচল প্রদেশ পর্যন্ত সৃষ্টিকর্তার অপরূপ প্রাকৃতিক লীলাবৈচিত্র্য ও স্বরূপ সন্ধানের আশায় পরিভ্রমণ করেছেন। যে পরিভ্রমণে কখনো প্রচন্ড শৈত্যপ্রবাহ

অনুভব করেছেন, কখনো অপূর্ব অরুণোদয় আভায় ব্রহ্মশ্লোক আবৃত্তি করেছেন। কখনও বা প্রিয় কবি হাফিজের কবিতার দার্শনিক আবেদনে আপ্লুত হয়েছেন। আবার বেদ-বেদান্তের চর্চায়ও নিমগ্ন থেকেছেন। সে পথ পরিভ্রমণের সময় কখনো প্রিয়জনের বিয়োগব্যথার সংবাদ এসেছে কিন্তু তা তাঁর ঐশ্বরিক-উপলব্ধি পথের অন্তরায় হয়নি। 'আত্মজীবনী'তে দেবেন্দ্রনাথের আত্মপরিচয় সত্য কিন্তু সাহিত্যরসে সমৃদ্ধ এই গ্রন্থের মূল্য চিরন্তন।[১৮]

আত্মজীবনীর প্রধান চরিত্রগুলিই দ্বন্দ্বমুখর। যেমন ১৮৫৬ সালে ভ্রাতা নগেন্দ্রনাথের ব্যবহার অত্যন্ত মর্মপীড়িত উপলব্ধি- "এতদিনে, এই দশবৎসরে ,আমাদের ঋণ অনেক পরিশোধ হইয়া গিয়াছে। পিতৃ-ঋণের মহাভার আমার অনেক কমিয়াছে। কিন্তু আর এক প্রকার নতুন বিপদভার, ঋণভার আমাকে জড়াইতে লাগিল। এই নূতন বিপদভার, ঋণভার-এর কারণ গিরীন্দ্রনাথ নিজ খরচের জন্য অনেক ঋণ করেছিলেন, এবং এখন আবার নগেন্দ্রনাথ তাঁহার নিজ ব্যয়ের জন্য অধিকাধিক ঋণ করিতে আরম্ভ করিলেন। কেবল নিজের ব্যয়ের জন্য নয়- এমনকি, ১০,০০০ (দশ হাজার) টাকা ঋণ করিয়া তিনি আর এক জনকে আনুকূল্য করিতেন"।[১৯]

প্রকৃতি প্রেম জগতের শ্রেষ্ঠ অনুভূতিগুলির মধ্যে অন্যতম। বাংলা গদ্য-সাহিত্যে প্রকৃতি বর্ণনার অফুরন্ত উদাহরণ আছে। দেবেন্দ্রনাথও তার ব্যাতিক্রম নন। কিন্তু তাঁর প্রকৃতি বর্ণনা কেবল বর্ণনামূলক বা বিবরণ নয়, মরমী ঈশ্বর সাধকের দিব্যদৃষ্টি দিয়ে দেখা প্রকৃতি মাতার অকল্পনীয় অনুপম সৌন্দর্য।

"আমি অমৃতসরে রামবাগানের নিকট যে বাসা পাইয়াছিলাম, তাহা ভাঙা বাড়ী, ভাঙাবাগান, এলোমেলো গাছ-জঙ্গলা রকম। কিন্তু আমার নবীন উৎসাহ, তাজা চক্ষু, সকলি তাজা, সকলি নূতন, সকলি সুন্দর করিয়া দেখিত। অরুণোদয়ে প্রভাতে আমি যখন সেই বাগানে বেড়াইতাম, যখন আফিমের শ্বেত পীত লোহিত ফুলসকল শিশির জলের অশ্রুপাত করিত, যখন ঘাসের রজত কাঞ্চন পুষ্পদল উদ্যানভূমিতে জরির মসনদ বিছাইয়া দিত, যখন স্বর্গ হইতে বায়ু আসিয়া বাগানে মধু বহন করিত, যখন দূর হইতে পাঞ্জাবীদের সুমধুর সঙ্গীত স্বর উদ্যানে সঞ্চরণ করিত, তখন তাহাকে আমার এক গন্ধর্বপুরী বোধ হইত"।[২০]

গদ্যের আঙ্গিক, নাটকের সংলাপ, গতি বা অ্যাকশন সাহিত্যের অন্যতম সম্পদ। 'আত্মজীবনী' এই বৈশিষ্ট্যগুলি নিবিড়তার সঙ্গে উপস্থাপিত করেছে। অলংকার প্রয়োগ, ভাব ও রচনাশৈলীর অনুপম উপস্থাপনায় ও ব্যক্তিমনের বিচিত্র জীবন-অভিজ্ঞতায় আত্মজীবনী কেবল আত্মচরিত নয় ঈশ্বরানুভূতির একটি প্রধান সূত্রও বটে। তত্ত্ব, কর্ম ও সংগঠনের সমন্বয়ে আত্মজীবনী সাহিত্যের সৌরভে আলোক মন্ডিত।

বাংলা সাহিত্যে গদ্যশিল্পীদের মধ্যে অক্ষয়কুমার দত্ত ও দেবেন্দ্রনাথ বাংলা গদ্যের রূপজ সংস্কৃতির দিকটি তুলে ধরেছেন। সমগ্র বাংলা গদ্যসাহিত্যের ইতিহাসে এই দুজন সার্থক শিল্পী হিসেবে স্বীকৃতি লাভ করেছে।।

<u>গ্রন্থসূত্র-</u>

১) প্রচলিত- 'খোকা ঘুমলো পাড়া জুড়লো বর্গী এলো দেশে

বুলবুলিতে ধান খেয়েছে খাজনা দেব কিসে?

২) বন্দোপাধ্যায়, পৃষ্ঠা ২০৩ - ২১৭

৩) রায়, দেবেশ, পৃষ্ঠা ২০ - ২১

৪) মুরশিদ, গোলাম, পৃষ্ঠা ৪০

৫) আচার্য, নির্মাল্য, পৃষ্ঠা ২২৬

৬) সেন, সুকুমার, পৃষ্ঠা ১৮০

৭) সেন, সুকুমার, পৃষ্ঠা ১৮৬

৮) সেন,সুকমার, পৃষ্ঠা ১৯৩

৯) সেন, নবেন্দু, পৃষ্ঠা ৫০

১০) সেন, সুকুমার, পৃষ্ঠা ৫২

১১) Harkara, Bengal, 7th june (1845),The Hare Anniversary meeting, Kolkata,page Advertagement

১২) সেন, নবেন্দু, পৃষ্ঠা ৫২

১৩) দত্ত, অক্ষয়কুমার, পৃষ্ঠা ৫৬

১৪) চট্টোপাধ্যায়, বসন্তকুমার, পৃষ্ঠা ২৬

১৫) বিশী, প্রমথনাথ ও দত্ত বিজিট, পৃষ্ঠা ১১০,

১৬) ঠাকুর, দেবেন্দ্রনাথ, পৃষ্ঠা ১২৪ থেকে ১২৫

১৭) শাস্ত্রী, প্রিয়নাথ, পৃষ্ঠা ২০৬ ২০৭

১৮) পাল, প্রফুল্লকুমার, পৃষ্ঠা ৪২-৪৩

১৯) খাস্তগীর, আশিস, পৃষ্ঠা ১৩৪ - ১৩৫

২০) খাস্তগীর, আশিস, পৃষ্ঠা ১২২

International Research Journal
IJNRD
Research Through Innovation

গ্রন্থপঞ্জী

১) বন্দোপাধ্যায়, শ্রীকুমার। *বাংলা সাহিত্যের বিকাশের ধারা।* ওরিয়েন্ট বুক কোম্পানী, কলকাতা, ১৯৯১।

২) রায়, দেবেশ। *আঠারো শতকের বাংলা গদ্য।* প্যাপিরাস, কলকাতা, ১৯৮৭।

৩) মুরশিদ, গোলাম। *কালান্তরে বাংলা গদ্য।* আনন্দ পাবলিশার্স, কলকাতা, ১৯৯২।

৪) আচার্য, নির্মাল্য। *বাংলা গদ্যের দুই শতাব্দী*/ আনন্দ পাবলিশার্স, কলকাতা, ১৯৮১।

৫) সেন, সুকুমার। *বাঙ্গালা সাহিত্যের কথা*/ কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়, ১৯৬৩।

৬) সেন, নবেন্দু। *গদ্যশিল্পী অক্ষয় কুমার দত্ত ও দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর*/ সাহিত্যলোক, কলকাতা, ২০০০।

৭) সেন, সুকুমার। *বাংলা সাহিত্যে গদ্য*/ ইস্টার্ণ পাবলিশার্স, কলকাতা।

৮) Harkara, Bengal, 7th june (1845),*The Hare Anniversary meeting.* Kolkata, page-Advertisement.

৯) সেন, নবেন্দু। *গদ্যশিল্পী অক্ষয়কুমার দত্ত ও দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর*/ সাহিত্যলোক, কলকাতা, ২০০০।

১০) দত্ত, অক্ষয়কুমার। *ভারতবর্ষীয় উপাসক সম্প্রদায় (প্রথম ভাগ)*/ ভুমিকাংশ ,প্রবাসী, ১৯১০।

১১) চট্টোপাধ্যায়, বসন্তকুমার। *জ্যোতিরিন্দ্রনাথের জীবনস্মৃতি*/ লালমাটি ,প্রকাশন, ২০২৩, কলকাতা,

১২) বিশী, প্রমথনাথ ও দত্ত, বিজিত। *বাংলা গদ্যের পদাঙ্ক*/ মিত্র ও ঘোষ, কলকাতা, ১৩৭২।

১৩) ঠাকুর, দেবেন্দ্রনাথ। *ব্রাহ্মধর্ম প্রথম খন্ড অনুষ্ঠান পদ্ধতি*/ ব্রাহ্মসমাজ পাবলিকেশন, কলকাতা, ১৯১৭।

১৪) শাস্ত্রী, প্রিয়নাথ। *পত্রাবলী, ১৩৪ সংখ্যক পত্র।* আদি ব্রাহ্মসমাজ প্রকাশনা হরিনাভি, কলকাতা, ১৮৫৪।

১৫) পাল, প্রফুল্লকুমার। *বাংলা গদ্যের প্রথম শিল্পীগোষ্ঠী*/ সাহিত্যলোক, কলকাতা, ২০২৩।

১৬) খাস্তগীর, আশিস (সম্পাদনা)। *দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর: চিঠিপত্র সংকলন* / সোপান, কলকাতা, ২০২৩।

১৭) খাস্তগীর, আশিস (সম্পাদনা)। *দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর আত্মজীবনী* / সোপান পাবলিকেশন, কলকাতা, ২০২৩।